

ମୁଖିଲେ
ଆବା
ପାତ୍ରୀ

ହୁମାଯୂନ ଆହମେଦ



দুর্ঘনিপো

অধীকন

সমৃদ্ধি



The Online Library of Bangla Books
 BanglaBook.org

হুমায়ুন আহমেদ



©

গুলাতেকিন আহমেদ

চতুর্দশ মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১২

অয়োদশ মুদ্রণ : জুলাই ২০১২

দ্বাদশ মুদ্রণ : মে ২০১০

একাদশ মুদ্রণ : জুন ২০০৮

দশম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৪

নবম মুদ্রণ : মে ২০০২

অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ১৯৯৫

ষষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবলি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচন্দ ও অলংকরণ

সমর মজুমদার

 The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Pencil'e Anka Pori (a Novel) by Humayun Ahmed

Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100

Fourteenth Edition October 2012.

একমাত্র পরিবেশক অবসর প্রকাশনা সংস্থা

বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

“সহয় মুছিয়া কেনে সব এসে
সময়ের হাত
সৌন্দর্যের করে না আঘাত
মানুষের বনে
যে সৌন্দর্য জলু লয় — শকনো পাতার মতো করে নাকে বনে
ঝরে নাকে বনে
নক্তও নিবে যায় — মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ
শ্রেষ্ঠ হয় — কমলার ফুল, বন, বনের পর্বত
মানুষের বনে
দে সৌন্দর্য জলু লয় শকনো পাতার মতো ঝরে নাকে বনে
ঝরে নাকে বনে।”

— জীবননন্দ দাশ



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :





ମୋବାରକ ସାହେବେର ଗଲାର ସବ ତାରି ଓ ସମସ୍ତରେ ।

କୋମଳ କରେ କିଛୁ ବଲାତେ ଶେଳେ ସବ ଆରୋ ଭାରି ହୟେ ଯାଏ । ତବୁ ତିନି ଟେଷ୍ଟା କରିଲେନ କୋମଳ କରେ କିଛୁ ବଲାତେ । ମେଯେଟୀର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧତେ ଏକଟୁ ଭାବ କରେ ନେବା ଦରକାର । ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଯେ— ଗଲା ଶୁଣେଇ ଯେଣ ଘାବଢୁ ନା ଯାଏ । କୀ ବଳା ଯାଏ? ନାମ ଜିଞ୍ଜିସ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଯେ କୋନୋ କଥେଗକଥନ ନାମ ଜାନାର ମାଧ୍ୟମେ ଶୁରୁ ହେତେ ପାରେ ।

ବାତ ଏଗାରଟା । ମେଯେଟି ଏବଂ ତିନି ବିଛାନାୟ ପାଶାପାଶି ଉଠେ ଆଚନ୍ତ ଅର୍ଥ ତିନି ତାର ନାମ ଜାନେନ ନା । ବେଶ ମଜାର ବାପାର । ମେଯେଟିଓ ନିଶ୍ଚଯଇ ତାର ନାମ ଜାନେ ନା । ନାକି ଜାନେ? ଏ ଜାତୀୟ ମେଯେରା ତଳେ ତଳେ ଥୁବ ଢାଳାକ ଢାଳାକ ହସି । ନାମଧାର ମବ ଜେନେ ନିଯାଇଛେ ହସିତେ ।

ମୋବାରକ ସାହେବ ହାସିର ଯତୋ ଭାଙ୍ଗି କରେ ବଲାଲେନ, ‘ତୋମାର ନାମ କି?’

ମେଯେଟି ରିଣ୍ଟରିଣେ ଗଲାଯ ବଲାଲ, ‘ଟେପୀ ।’

‘କୀ ନାମ ବଲାଲେ?’

‘ଟେପୀ । ଟ-ଏକାରେ ଟେ, ପ ଇ-କାରେ ପୀ— ଟେପୀ ।’

ମୋବାରକ ସାହେବ ଗଞ୍ଜୀର ଗଲାଯ ବଲାଲେନ, ‘ଫାଜଲାମି କରଇ ନାକି?’

‘ଫାଜଲାମି କରି କେବେ? ନାମ ଜିଞ୍ଜିସ କରେଛେନ, ନାମ ବଲାଲାମ ।’

ମେଯେଟା ହାସିଛେ । ବନବନ ଶଙ୍କେ ହାସିଛେ । ମୋବାରକ ସାହେବ ଉଚୁ ଗଲାଯ ବଲାଲେନ, ‘ସତି ସତି ତୋମାର ନାମ ଟେପୀ?’

‘ହଁ । ଆମାର ବଡ଼ ବୋନେର ନାମ ହାପୀ । ତାର ସଙ୍ଗେ ମିଲିଯେ ଆମାର ନାମ ଟେପୀ ।’

ଆବାରୋ ଖିଲଖିଲ ହାସି । ମେଯେଟାର ଗଲାର ଭେତର କି ଏକଗାନ୍ଦା କୃଷ୍ଟାଲେନ୍ଟରା ଯେବେ ଦେଇବ । ହାସିଲେଇ ବନବନ ଶଦ । ନାକି ଏହି ବରସେର ମେଯେରା ଏ ରକ୍ତ କରେଇ ହୁଅଛେ ।

ମୋବାରକ ସାହେବେର ଧାରଣା ହଲ, ମେଯେଟା ତାର ସଙ୍ଗେ ଫାଜଲାମି କରିଛେ । ପୁଚକା ଏକଟା ମେଯେ ଫାଜଲାମି କରିଛେ, ଭାବାଇ ଯାଏ ନା । ମେଯେଟାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ? କୁଡ଼ି-ଏକୁଶ, ନାକି ତାରଟ୍ଟେପେ କମ?

ମେଯେଟି ଫାଜଲାମି କରିଛେ କିନା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଦରକାର । କୀଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେନ ମୋବାରକ ସାହେବ ବୁଝିଲେ ପାରିଛେନ ନା । ହାପୀର ସଙ୍ଗେ ମିଲିଯେ ଟେପୀ ନାମ କେଉଁ ରାଖିଲେ ରାବିଲେ ପାରେ । ଗୋ-ଫ୍ଲାମ ଫ୍ୟାମିଲିତେ ନାମ ନିଯେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟ ଘାମାଯ ନା । ଅର୍ଥମ ବାକ୍ତାଟାର

নাম ঠিকঠাক যতো বাখে; তারপর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

‘তোমরা কি দুই বোন?’

‘না, তিনি বোন।’

‘তৃতীয় বোনের নাম কি?’

‘পেপী।’

মোবারক সাহেব ধ্যানে গলায় বললেন, ‘তৃতীয় বোনের নাম পেপী?’

‘ছি। বোনদের নাম মিলিয়ে রাখতে হয়। নাম মিলিয়ে না রাখলে বেহেশতে বোনে
বোনে দেখা হয় না।’

‘তুমি পড়াশোনা কতদুর করেছ?’

‘ব্লাস ফাইভ।’

‘কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় ক্লাস ফাইভের চেয়ে বেশি পড়েছ এবং আমার ধারণা
তুমি আমার সঙ্গে রাসিকতা করার চেষ্টা করছ।’

‘আপনি মুবারি মানুষ। আপনার সঙ্গে রাসিকতা করব কেন?’

তিনি বাতি জ্বালালেন।

বাতি জ্বালাত্ব মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল—‘বাতি নেভান। বাতি নেভান, গায়ে কাপড়
নাই।’ তিনি বাতি নিয়ে দিলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘এখন জ্বালেন। কাপড়
পরেছি।’

তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাঙ্গের কাছে রাখা সিগারেটের
প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাশেন। লাইটারের আলোয়
মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছা করছিল, সেই ইচ্ছা দমন করলেন। তিনি সৃষ্টি এক ধরনের অহস্তি
বোধ করছেন। মেয়েটির কোনো একটা ব্যাপার তাঁর পছল হচ্ছে না। সেটা যে কী তাও
বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির চুল থেকে কোনো বিপালসিভ গন্ধ কি আসছে? কিংবা শাড়ি
থেকে ন্যাপথলিনের ঘুণ? এইসব মেয়েরা তাদের ভাসো শাড়িগুলোর ভাঁজে ভাঁজে
ন্যাপথলিন দিয়ে রাখে। যেন পোকায় কেটে শাড়ি নষ্ট না করে।

সিগারেট টেনে তিনি আরাম পাচ্ছেন না। তামাকের গঞ্জটা অনেক কড়া জাগছে। বমি
বামি জাগছে। সিগারেট ফেলে দিতে হবে। টেবিল ল্যাঙ্গের কাছে আশ্বিন্ত থাকে, আজ
নেই। হাউসকিপিং ঠিকমতো হচ্ছে না। তিনি খাট থেকে নামলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল,
‘কোথায় ঘান?’

তিনি জ্বাব দিলেন না। অঙ্ককারেই বাধকমে চুকলেন। বাধকমের স্বাতি জ্বালালেন।
আঘানায় নিজেকে দেখলেন। যতটা না বয়স তারচেয়েও কি বেশি জ্বাবাছে? তাঁর বয়স
তিপ্পান, আঘানায় একজন বুড়ো মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তিনি জ্বালিস্ত সিগারেট করমোড়ে
ফেলে দিলেন। ফ্লাশ টানলেন। পানির সঙ্গে সিগারেট চলে গুছে না। ভাসতে থাকল। মুখে
পানি ছিটিয়ে টাওয়েল হাতে শোবার ঘরে চুকলেন। শোবার ঘরের প্রধান সুইচটি টিপে
দিলেন। একসঙ্গে তিনটি বাতি জ্বালে ঘরটাকে ঝলমলে করে ফেলল।

মেয়েটি তাকে যিথা বলেছে। সে কাপড় পরে নি। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে স্থায়
আছে। কোতুহলী চোখে তাকে দেখছে। মেয়েটা দেখতে ভালো। বয়সের নিজস্ব সৌন্দর্য

ছাড়াও বাড়তি কিছু তার মধ্যে আছে। রং শ্যামলা। রং শ্যামলা বনেই চোখের কাজল এত
সুন্দর লাগছে। কাটা কাটা নাক-মুখ। মেয়েটির চুল বেশি করা ছিল, এখন নেই। এক
ফাঁকে নিষ্ঠয়ই খুলেছে। কখন খুলেল?

টেপী বলল, ‘আপনার কি শরীর খারাপ করেছে?’

তিনি জবাব দিলেন না, তবে প্রশ্নটা শোনার পর থেকে তাঁর শরীর একটু খারাপ
লাগতে লাগল। মাথা বিষ ধরে আছে। বমি ভাবটা যায় নি। তিনি শোবার ঘরের জানালার
দিকে এগালেন— একটা জানালা খুলে দিতে হবে। ঘরে বিশুদ্ধ কিছু বাতাস ঢুকুক।
এখারকুলার চলছে বলে সব ক’টা জানালা বন্ধ। সিগারেটের ধোয়া ঘরে আটকে আছে।
সিগারেটের ধোয়া যত বসি ইয়ে তার উৎকট তাৰ ততই বাড়ে। জানালার পাশে তাঁর
ফ্রিজার। শোবার ঘরে কেউ ফ্রিজার রাখে না। তিনি রেখেছেন। তাঁর ঘূৰ ঘন ঘন পিপাসা
হয়। তখন বৰক্ষণীতস পানি খেতে হয়। এই ফ্রিজারটা ভালো, পানি রাখামাত্র ঠাঙ্গা হয়।
জানালা না খুলে তিনি তাঁর ফ্রিজারের দৱজা খুললেন।

এখন তাঁর কোনো পিপাসা হয় নি। তবু ঠিক করলেন আধগ্নাস পানি খাবেন— এতে
যদি অস্বস্তি ভাবটা কাটে। তিনি পানির বোতল বের করলেন। ফ্রিজারের উপর দু’টা পানির
গ্লাস থাকার কথ— তাই আছে। তিনি গ্লাসে হেপে মেপে আধগ্নাস পানি ঢাললেন। বেশিও
না, কমও না।

মেয়েটি বলল, ‘কী খান? মদ?’

মোবারক সাহেব সহজ গলায় বললেন, ‘না, পানি যাই।’

‘আমি ভাবছিলাম মদ।’

মেয়েটি আবার হাসছে। না, হাসি সুন্দর। বানবানে শব্দটা শনতে ভালো লাগছে।

মোবারক সাহেব কখনো এক চুমুকে পানি খান না। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দেন।
আজ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে বললেন, ‘তোমার নাম হচ্ছে টেপী, তাই তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘শোন টেপী, তুমি বাসায় চলে যাও।’

টেপী অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার ভুক্ত কুঁচকে গেছে। এতক্ষণ দে শয়ে ছিল, এখন
আধশোয়া হয়ে বসল।

‘বাসায় চলে যাব?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?’

‘রাগ করি নি। তুমি কাপড় পর, কাপড় পরে বাসায় চলে যাও।’

‘এত রাতে বাসায় কীভাবে যাব?’

‘ড্রাইভার আছে। ড্রাইভার তোমাকে পৌছে দেক্তে অসুবিধা হবে না। তুমি থাক
কোথায়?’

‘অনেক দূরে থাকি। জয়দেবপুর।’

‘ড্রাইভারকে বললেই হবে।’

মোবারক সাহেব শক্তি করলেন মেয়েটার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। সে চাদরের নিচেই ব্লাউজ পরার ছেঁটা করছে। ফুলতোলা চাদর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে। মেয়েটাকে ভালোমতো কাপড় পরার সুযোগ দেয়ার জন্মেই তার এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি পেলেন না। এদের অশ্রু দেয়ার কোনো কারণ নেই। ট্রিটগার্লদের স্ট্রিটগার্লের মতোই ‘ট্রিট’ করা উচিত। মেয়েটাকে অবশ্যি স্ট্রিটগার্লের যতো দেখাচ্ছে না। তত্ত্ব পরিবারের আহলাদী মেয়ের মতো লাগছে। কে জানে মেয়েটা হয়তো এই জীবনেই সুখী।

‘তোমার ঐ জয়দেবপুরের বাসায় কে থাকেন? তোমার বাবা-মা?’

মেয়েটি চাদর দাঁত দিয়ে চেপে ধরেই কথা বলছে। কথাগুলো অস্পষ্ট এবং জড়ানো শোন যাচ্ছে। সে বলল, ‘মা থাকে আর আমার ছোট মামা।’

‘বাবা কি মারা গেছেন?’

‘না, বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না।’

‘বেন দু’জন থাকে? হ্যাপী এবং পেপী?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার ভালো নাম কি?’

‘আমার একটাই নাম। আচ্ছা জাপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?’

মোবারক সাহেব জবাব দিতে পিয়েও জবাব দিতে পারলেন না, একটু চমকে উঠলেন। কারণ মেয়েটি চাদর ফেলে দিয়েছে। ব্লাউজ সে ঠিকমতো পরে নি। বোতাম লাগানো হয় লি। ব্রাউজের নিচে কাঁচুলি নেই। গভীর আমন্ত্রণের ছবি। সে বলল, ‘এত রাতে বাসায় গেলে আমার খুব অসুবিধা হবে। আমি বলে এসেছি সারারাত শ্যাটিং।’

মোবারক সাহেবের মনে পড়ল— এই মেয়ে ছবিতে কাঞ্চ করে। এক্সট্রা। মূল নায়িকার সঙ্গে নাচে কিংবা গান গায়। নায়িকা যখন পুকুরে মেমে জলকেলি করে তখন সেও সঙ্গে থাকে। নায়িকার ডেঙ্গা শরীরের সঙ্গে তার ডেঙ্গা শরীরও দেখা যায়। এই মেয়েটির ডেঙ্গা শরীর নিশ্চয়ই নায়িকার শরীরের চেয়ে অনেক সুন্দর।

‘তোমার হাতে এখন যে ছবি তার নাম কি?’

‘প্রেম দেওয়ানা।’

‘ছবিতে তুমি যে কঁরিষ্টো করছ সেটা কি নায়িকার স্বীকৃতি?’

‘উহঁ— আমি খারাপ লোকদের আন্তর্নার একজন বাস্টেজী।’

‘গান গাও, না মাচ?’

‘নাচ।’

‘নাচ জান?’

‘না। ড্যাসমাস্টার আছে, শিখিয়ে দেয়। ঐগুলা নাচ না— হাত-পা নড়া।’

মোবারক সাহেব শক্তি করলেন মেয়েটার কথা শুন্নুক তার ভালো লাগছে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে এত কথা তিনি কারো সঙ্গে বলেন নি। আজখনে ফেলেছেন। কথা বলতে ভালো লাগার কারণ কি? মেয়েটির গলার স্বর অস্থান্তরিক সুন্দর এটা একটা কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় কারণটা স্থুল। খোলা ব্লাউজে মেয়েটি যে তঙ্গিতে বসে আছে সে ডিস্টা দেখতে

তালো আগে। মোবারক সাহেবের ঘনে হল পুরুষ অশুরু করার এই ভঙ্গিটা মেয়েটি আগেও ব্যবহার করেছে। এটি তার বহু ব্যবহৃত কৌশল।

‘আপনি কি আমার নাচ দেখবেন?’

‘নাচ?’

‘আপনার ঘরে নাচের বজেল আছে না? ইংরেজি বাজনা।’

‘তুমি তো নাচ জান না। বাজনা থাকলে কী হবে? তাছাড়া নাচ দেখতে আমার ইচ্ছা করছে না। তুমি কাপড় পর। কাপড় পরে চলে যাও।’

‘সারাগাত শ্যাটিংয়ে কথা বাসায় বলে এসেছি।’

‘বলবে শ্যাটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে। তোমাদের শ্যাটিং ক্যানসেল হয় না?’

‘হয়। আমরা বলি প্যাকআপ।’

‘বাসায় গিয়ে তাই বলবে। বলবে শ্যাটিং প্যাকআপ হয়েছে।’

‘আচ্ছা আমি বলব। এখন আপনি অন্য ঘরে যান। আমি শাড়ি পরব।’

‘অন্য ঘরে যেতে হবে না। আমার সামনেই পর।’

‘আপনার সামনে আমি পরব কেন? আপনি কি আমার স্বামী?’

মেয়েটি কঠিন গলায় কথাগুলো বললেও তার মুখ হাসি হাসি। মোবারক সাহেব ঘর ছেড়ে গেলেন না। ওয়ার ড্রোব খুলেন। হাঁটোরে পাঞ্জাবি ঝুলানা আছে। পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগ। মেয়েটিকে টাকা-পয়সা আগেই দেয়া হয়েছে— আরো কিছু দেয়া যাক। তিনি চারটা পাঁচ শ টাকার নোট বের করলেন। এক্সট্ৰা অভিনেত্রী হিসেবে এই মেয়ে কত রোজগার করে কে জানে।

‘তুমি যে অভিনয় কর কত পাও?’

‘শিফট হিসাবে পাই। এক শিফটে দু শ পঞ্চাশ টাকা।’

‘কতক্ষণে এক শিফট?’

‘আট ষষ্ঠ্যায় এক শিফট।’

‘নাও টাকাটা রাখ।’

‘কেন?’

‘খুশি হয়ে দিছি।’

‘খুশি তো আপনি হন নাই। আপনি বেজাৰ হয়েছেন।’

‘না আমি খুশি, নাও।’

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। মোবারক সাহেব পাশের ঘরে টেল এগেন। এই কামরা শোবার ঘরেরই এক্সটেনশান। ছেট্ট একটা বসার ঘর। চারবাহি সিঁড়িটা নিচু চেয়ার। একটা লেখার টেবিল। টেবিলের পাশে আরেকটা তাকে পাসেনাল কম্পিউটার— মেকেনেটস এল সি স্ট্রি। এই কম্পিউটার তিনি শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব খেলার জন্যে ব্যবহার করেন। কম্পিউটারে দাবার উপর খুব ভালো একটা প্রোগ্ৰাম আছে। ঘরের এক প্রাণ্তে বইয়ের শেলফ। একগাদা ইংরেজি ভূতের বইয়ে শেলফ ভর্তি। আসবাব বলতে এই।

মোবারক সাহেব লেখার টেবিলে বসলেন। টেবিলের উপর পেঁজ মার্ক লাগানো একটা

বই— ষ্টিডেন ওয়াইনবার্গের— “The first 3 minutes”. প্রথম চ্যাপ্টারে পেজ মার্ক দেয়। প্রথম চ্যাপ্টারের নাম— The Giant and the Cow. দৈত্য ও গুরু। চ্যাপ্টারের শিরোনাম হিসেবে সুন্দর। তিনি পেজ মার্ক দিয়েছেন, পড়তে ভুক করেন নি।

টেবিলের উপর ইন্টারকমে ছেট্টি লালবাতি জুলছে। ইন্টারকমের বোতাম টেপামাত্র একতলা থেকে ইদরিস বলবে, স্যার স্লামানিকুম।

এখন রাত বেশি না— এগারটা চার্লিশ। রাত তিনটায় বোতাম চিপলেও সঙ্গে সঙ্গে ইদরিসের সাড়া পাওয়া যাবে।

তিনি ইন্টারকমের বোতাম চিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইদরিস বলল, ‘স্যার স্লামানিকুম।’

‘ইদরিস তুমি মেয়েটিকে পৌছে দিয়ে এস।’

‘জু আচ্ছা স্যার।’

‘আজ আমার সাইড টেবিলে অ্যাশট্রে ছিল না কেন ইদরিস?’

ইদরিস ঝুঁক দিল না। তিনি বুঝতে পারছেন ইদরিসের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম অঘচ্ছে।

‘কেউ কি টেলিফোন করেছিল?’

‘আমা টেলিফোন করেছিলেন। আমি বলেছি আপনি ঘূমিয়ে পড়েছেন।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমা বলেছেন ধূৰ জুরুরি।’

‘আচ্ছা।’

মোবারক সাহেব ইন্টারকম নামিয়ে রাখতেই দরজা ধরে মেয়েটি দাঁড়াল। মেয়েটিকে এখন কেমন অসহ্য সাগছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, ‘আমি যাই।’

‘আচ্ছা।’

‘আপনি আমার উপর রাগ করেছেন কেন আমি বুঝলাম না।’

‘রাগ করি নি। আমি আরেকদিন তোমার নাচ দেখব।’

‘বের হব কোন দিক দিয়ে?’

‘দরজা খুলে হলবলে চলে যাও। সেখান থেকে নিচে নামার সিঁড়ি আছে। নিচে নামলেই দেখবে ইদরিস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।’

‘জু আচ্ছা।’

এত বড় বাড়ি কিন্তু কোনো শব্দ নেই। সুনসান নীরবতা। মোবারক সাহেব কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটির নেমে যাওয়ার শব্দ শুনলেন। কলাপসিবল গেট প্লাটফর্মের শব্দ শুনলেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বের হবার শব্দ শুনলেন। তখন তাঁর মনে হল মেয়েটিকে রেখে দিলে পারতেন। টুকটাক করে সুন্দর কথা বলছিল। মাঝে মাঝে স্বাক্ষ তুচ্ছ কথা শুনতেও ভালো লাগে। তিনি আবারো কলিখবেলে হাত রাখলেন, ইদরিস স্লাম, স্যার স্লামানিকুম। ইদরিস তাহলে মেয়েটির সঙ্গে যায় নি। ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইদরিস তাকে একা রেখে যাবে না এটা ধরে নেয়া যাব।

‘ইদরিস।’

‘জি স্যার।’

‘বাসার সঙ্গে টেলিফোন কানেকশন করে দাও, রেহানার সঙ্গে কথা বলব।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

তিনি টেলিফোন ধরার জন্যে লিপিতে চলে এলেন। তাঁর শোবার ঘরে কোনো টেলিফোন নেই।

‘কে রেহানা?’

‘হঁ। খুমা একটু আগে ইদরিস বলল তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।’

‘তুল বলেছে। আমি জেগেই ছিলাম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলাম, ইদরিস ভেবেছে ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি টেলিফোন করেছিলে কেন?’

‘নাজু আ্যাকসিডেন্ট করেছে।’

নাজুটা কে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না। তাঁর শুভ্রবাঢ়ির দিকের কেউ হবে। রেহানার দশ হাজার আঞ্চীয় আছে ঢাকা শহরে। তাদের সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। চেনার কোনো প্রয়োজনও নেই।

‘তামাবহ অ্যাকসিডেন্ট। কী হয়েছে শোন ...’

মোবারক সাহেব দীর্ঘ গল্প শোনার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। রেহানা অস্থ কথায় কিছুই বলতে পারে না। ‘সামাজি এন্ড সাবসেক্স’ বলে তার কিছু নেই। সে ছোট একটা গল্পকে রবারের মতো টেনে ধূঁত্ব করবে। মূল গল্প বলতে বলতে শাথা গঞ্জে চলে যাবে। সেখান থেকে যাবে প্রশাখায়...। এক সময় কোনটা আসল গল্প কোনটা প্রশাখা কিছুই বোৰা যাবে না।

‘নাজু নিউ এলিফ্যাট রোডে মোজা কিনতে গিয়েছিল। বাটা সিগন্যালের কাছে যে দোকানগুলো ছিল সেখান থেকে মোজা কিনে গাড়িতে উঠেছে। আজ আবার তার ড্রাইভার আসে নি। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। ষ্টার্ট নেবার সময় হঠাৎ অ্যাঙ্গিলেটের চাপ দিয়ে ফেলেছে—সামনে এক লোক গ্যাস বেলুন বিক্রি করছিল, উকে হিট করল ...’

মোবারক সাহেব ওয়াইনবার্গের বইয়ের পাতা খণ্টাচ্ছেন। পড়তে শুরু করবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। অ্যাকসিডেন্টের গল্প দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলার কথা। ক্লিনিকে কথা একজন মানুষ কী করে বলতে পারে? মোবারক সাহেব টেলিফোনের কথা শোনায় আবার মন দিলেন— যাবাখানে তিনি বোধহয় কিছু মিস করেছেন, এখন হচ্ছে জনাদিনের কক্ষের কথা। অ্যাকসিডেন্ট থেকে জনাদিনের কেকের গল্প কীভাবে চলে এল কে জানে?

‘সোনারগাঁয়ে গিয়েছে কেকের জন্যে— ওরা বলল, দু’কেজির কম ছলে কালই দিতে পারবে। এক শ মানুষের জন্যে দু’কেজি কেক-এ কি হবে? আর তামাচ করেও তো হবে না। তুমিই বল, জনাদিনে এক শ মানুষ হবে না?’

কার জনাদিনে এক শ মানুষ হবে মোবারক সাহেব কিছুই জানেন না। তারপরেও বললেন, ‘আমার ধারণা এক শ বেশি হবে।’

‘এই তো তুমি বললে এক শ বেশি হবে। আমি তাই বলছি। কুনীর ধারণা কেউ আসবে না ...’

মোবারক সাহেব কথার মাঝখানে কথা বলার মতো অভদ্রতা শেষ পর্যন্ত করলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘রেহানা শোন, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি বরং শয়ে পড়ি।’

‘কবন মাথা ধরল?’

‘সন্ধ্যা থেকেই।’

‘সে কী! কেনে ডাঙ্গার ডাক নি।’

‘সামান্য মাথাধরা। তার জন্যে আবার ডাঙ্গার।’

‘মাথাধরা কখনো সামান্য ভাববে না। অনেক মেজর ডিজিজের ফার্স্ট ওয়ার্নিং হচ্ছে মাথাধরা। মাথাধরাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।’

‘আচ্ছা এখন থেকে সিরিয়াসলি নেব। রেহানা রাখি?’

রেহানা কিছু বলার আগেই তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। ঘূর্ম আসছে কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্লান্তি লাগছে। ক্লান্তি এবং ঘূর্ম পাওয়া এক জিনিস নয়। রাত জেগে খানিকক্ষণ ভূতের গল্প পড়া যেতে পারে। ঘূর্ম আনার জন্যে ভূতের গল্প খুব কাজে আসে।

মোবারক সাহেব বিশ্বিত হয়ে লক্ষ করলেন পাঁচ শ টাকার নেট চারটি চাদরের উপর পড়ে আছে। মেয়েটি কি ভুল করে ফেলে গেছে, না ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। অতি ভুচ্ছ যে মানুষ, তারও খানিকটা অহংকার থাকে। সেই অহংকারের কারণে টাকা রেখে যাওয়া? তা বোধহ্য না। মেয়েটি শুধু যে টাকা ফেলে গেছে তাই না— চুলের ফিতাও ফেলে গেছে। মেয়েরা চুলের ফিতা, খোপার কাঁটা এইসব ব্যাপারে খুব সাবধানি হয়। এই মেয়েটি সন্তুষ্ট ভঙ্গে যানেব। সে হ্যাতে ভেবেছ তার হ্যান্ডব্যাগে টাকাগুলো রেখেছে ‘আসলে রাখে নি

তিনি ভূতের গল্পে মন দেবার চেষ্টা করলেন। এলিন নামের একটা মেয়ে একা একা তার আ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকে। সেভেন ইলিভেন শপে কাজ করে রাত দশটাৰ দিকে ফেরে। শীতের রাত— ঘন কুয়াশা পড়েছে। ঘন কুয়াশার জন্যে এলিনের মনে হচ্ছে কে যেন তাকে ফলো করছে। সে যখন হাঁটে তখন পেছন থেকে জুতার শব্দ পাওয়া যায়। সে থেমে গেলেই জুতার শব্দ থেমে যায়। এলিন ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল ‘কে?’

‘আমি।’

যে আমি বলল তার গলার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। অথচ এলিন সেই পরিচিত শব্দ চিনতে পারছে না। এলিন তয়ে তয়ে বলল, ‘কুয়াশার জন্যে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পারছি না। তুমি কি দয়া করে এগিয়ে আসবে?’

বটবট জুতার শব্দ করে যে এগিয়ে এল সে দেখতে অবিকল এলিনের মতো। পোশাকও পরেছে এলিনের মতো। গলায় লাল স্কার্ফ। হাতে হলুক সেস্টানা। গায়ে ছাইরঙা গ্রেজার।

মোটামুটি জয়াট গল্প। খুব জয়াট গল্প মোবারক সাহেবের ঘূর্ম ধরে যায়। মন্তিক্ষের একটি অংশ গল্পটা পড়তে চায়। অন্য অংশ বলে— উঠে পড়। ঢোকের পাতা ভারি হয়ে আসে।

গল্পটা পড়ার জন্যে উৎসাহ যত বাড়ে, ঘূর্মও ততই বাড়ে। আজ তা হচ্ছে না। আজ

তিনি সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছেন। যন্ত্রণাও ঠিক না—অস্থি। মশারি ঝাঁটিয়ে ঘুমুতে যাবার পর কেউ যদি সেখানে ফুটো আবিষ্কার করে তখন যেমন অস্থি লাগে, সে ব্যক্ত অস্থি। চোখে ঘুম না আসা পর্যন্ত মনে হয় এই বুঝি ফুটো দিয়ে মশা চুকে গেল।

তাঁর অস্থিটির কারণটা কি? মেয়েটা এই বিছানাতেই শয়েছিল—চাদর বদলালো হয় নি। তার গায়ের গন্ধ চাদরে লেগে আছে এই জন্যেই কি অস্থি?

মোবারক সাহেব বিছানার চাদর বদলালেন। বালিশের ওয়ার বদলালেন। লাভ হল না। রাত সাড়ে চারটা পর্যন্ত তিনি অধূমো বসে রইলেন। অথচ তাঁর ঘুম দ্বরকার। কাল সন্ধ্যায় তিনি জাপান যাবেন। তাঁর একটা জাহাজ টেরিফ আইন ভঙ্গের দায়ে জাপানে আটকা পড়েছে। জাহাজের স্কিপারের লাইসেন্সও নাকি কী সমস্যা আছে। তাঁকে থেতে হবে। দীর্ঘ ক্লান্তিকর প্রমধের আগে আরাম করে ঘুমানোর প্রয়োজন ছিল।

তিনি ভূতের বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিসিন বক্স থেকে ঘুমের ওষুধ বের করে থাবেন। একটা হিপনগ তার সঙ্গে দু'টা প্যারাসিটামল। ওষুধ খাবার পর গরম এক কাপ কফি খেলে ভালো হত। কফি খেলে সবার ঘুম চটে যায়। তার উন্টেটা হয়—ঘুম পায়।

মোবারক সাহেব ওষুধ খেয়ে পাশের ঘরে পেশেন। ইঞ্টারকম তোলামাত ইদরিস বলল, স্যার প্লায়ালিকুম। মোবারক সাহেবের ধারণা তিনি যে ক'দিন এ বাড়িতে থাকেন সে ক'দিন ইদরিস ঘুমায় না। ইঞ্টারকমের পাশে জেগে বসে থাকে।

‘ইদরিস।’

‘ছি স্যার।’

‘কড়া করে এক কাপ কফি খাওয়াও তো।’

‘ছি আচ্ছা স্যার।’

‘এ যেয়েকে কি দিয়ে এসেছে?’

‘অনেক আগেই গাড়ি চলে এসেছে।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

তিনি আবার শোবার ঘরে চলে এলেন। বাতি মিডিয়ে ঘর অন্ধকার করে গরম কফির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল— মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে জাপানে নিয়ে গেলে কেমন হয়। মেয়েটির জন্যে সেটা একটা অকম্পনীয় ব্যাপার হবেও! সে হয়তো জীবনের প্রথম গেলে চড়বে, জীবনের প্রথম দেশের বাইরে যাবেও! পদে পদে বিশিষ্ট হবে। তিনি ঘুব কাছ থেকে সেই বিশিষ্ট দেবখেন। বিশিষ্ট মানুষকে দেখতে ভালো লাগে। তার আশপাশে যারা থাকে তারা কেউ বিশিষ্ট হয় না। জিনি নিজেও বিশিষ্ট হওয়া ভুলে গেছেন।

এক দিনে মেয়েটির পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা কৃষ্ণ সমস্যা নয় বলেই তিনি মনে করেন। লোকমানকে খবর দিলেই সে ব্যবস্থা করবে। লোকমান পারে না এমন কাজ নেই। যে কোনো কাজ দিয়ে তিনি যদি লোকমানকে বলেন— লোকমান পারবে না? লোকমান তখন হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকবে, মাথা চুলকাবে— ছেট্ট করে নিশ্চাস

ফেলবে। তার ভাব দেখে মনে হবে সে গভীর সম্মতি পড়েছে কিন্তু বলবে সম্পূর্ণ উন্টো কথা। অস্পষ্ট গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলবে— কেন পারব মা?

এ ধরনের কথা বলার লোক দ্রুত করে যাচ্ছে। কোনো কাজ দিলে বেশিরভাগ লোক বলে, স্যার চেষ্টা করে দেখব। সেই চেষ্টাও করে না।

দরজায় টোক পড়ছে। গরম কফি নিয়ে ইদরিস চলে এসেছে। লোকমানের মতো এই আরেক জন। কুকুরের মতো অনুগত।

‘ইদরিস ভেতরে আস।’

ইদরিস চুকল। মোবারক সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। কখনো তাকায় না। টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল। মোবারক সাহেব কাপ হাতে নিয়ে হোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, ‘কফি ভালো হয়েছে। শোন ইদরিস, আমি সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমব।’

‘ছি আচ্ছা স্যার।’

‘লোকমানকে আমার একটু দরকার।’

‘দশটার সময় আসতে বলব স্যার।’

তিনি জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। ইদরিস বলল, ‘এখন কি স্যার টেলিফোনে ধরে দেব? কথা বলবেন?’

মোবারক সাহেব একটু চমকে গেলেন। এই মুহূর্তে তিনি ঠিক টেলিফোনে কথা বলার কথাই ভাবছিলেন। বুব যারা অনুগত তাদের মধ্যে টেলিপ্যাথিক সেন্স কাজ করে। ব্যাপারটা তিনি আগেও শুনেছেন। কুকুর তার প্রভূর মুড় বুঝতে পারে— কুকুরের মতো যারা অনুগত তারাও পারে।

‘দাও, টেলিফোনে ধরে দাও।’

‘ছি আচ্ছা স্যার।’

তিনি হালকা চুমুকে কফি খাচ্ছেন। কফি খেতে তার ভালো জাগছে। ইদরিস এখনে টেলিফোনের লাইন দেয় নি। এখন দেবেশ না— স্যারের কফি খাওয়া কখন শেষ হবে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। তিনি কফি শেষ করে কাপ টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। এও কি টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ?

‘স্যার আমি লোকমান। আপনার শরীর ভালো স্যার?’

‘হ্যা। তুমি কেমন আছ লোকমান?’

‘আপনার দোয়া স্যার।’

‘এত রাতে তোমাকে জাগালাম ...’

‘কোনো অসুবিধা নেই স্যার। আমি জেগেই ছিলাম।’

‘জেগে ছিলে কেন?’

‘আমার স্যার একটা অসুখ আছে। রাতে ঘুম হয়েনি।’

‘জানতাম না তো।’

‘আমাকে ঘোঁজ করছিলেন কেন স্যার?’

‘শোন লোকমান, কাল দিনের তেতর তুমি একটা পাসপোর্ট এবং জাপানের তিসার
ব্যবস্থা করতে পারবে?’

‘পাসপোর্ট কেনেৰো ব্যাপার না স্যার।’

‘তিসা পাওয়া যাবে না?’

‘কাল তো স্যার রোববার—জাপান এছেমি বন্ধ। সব ফরেন এছেমিই বন্ধ।’

‘তিসা তাহলে সম্ভব না?’

‘সম্ভব না এমন কথা তো স্যার আমি বলি নি।’

‘পারবে?’

‘কেন পারব না?’

মোবারক সাহেব তৃষ্ণির হাসি হসলেন। লোকমান বলল, ‘স্যার যাবে কে?’

‘তুমি সকালে চলে এস তখন বলব।’

‘ছি আচ্ছা স্যার।’

‘কত দিন ধরে তুমি রাতে ঘুমুতে পার না?’

‘অনেকদিন স্যার।’

‘অনেকদিন মামে কত দিন?’

‘থায় চার বছর।’

‘ও আচ্ছা। টেলিফোন তাহলে রাখি?’

‘ছি আচ্ছা স্যার। আমি সকালে চলে আসব।’

মোবারক সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধূলেন।
অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করলেন। কফির মিষ্ঠি শাদ মুখে নিয়ে ঘুমুতে ঘাওয়া যায় না।
একটু পান খেতে পারলে হত। মৌরি দেয়া ছেট্ট এক খিলি পান।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। পর পর দু'বার হাই উঠল। শরীরে অঙ্গজেনের অভাব
হচ্ছে। লোহিত রক্ত কণিকারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে— তারা এখন আর আগের মতো
অঙ্গজেন নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারছে না।

তিনি জানালার তিনিশিয়াল রাইঙ্গুলো টেনে দিলেন। দিনের আলো যেন ধরে না
ঢোকে। পাঁচ ঘণ্টা তিনি একলাগাড়ে ঘুমুবেন। ফাইত লং আওয়ার্স। প্রি হানড্রেড মিনিটস।

পুরোপুরিভাবে বিছানায় যাবার আগে আবারো কী মনে করে ইন্টারকমেন্ট ব্যাতাম
টিপলেন। ইদরিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, প্রামাণিকুম স্যার। তার বোধহয় পোকজানের মতো
অনিদ্রা রোগ আছে।

‘ইদরিস।’

‘ছি স্যার।’

‘লোকমানের সকালে আসার দরকার নেই। ওকে নিষেধ করে দিও।’

‘ছি আচ্ছা স্যার।’

মুহের শ্বেত, গরম কফি, সারাদিনের ক্লান্তি সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে— মোবারক
সাহেব দুমে তগিয়ে যেতে ধরেছেন। তাঁর ক্ষেম যেন একা লাগছে। একটু ত্য ত্যও

পাগছে। একজন কেড় পাশে থাকলে ভালো পাগত। গভৌর ঘুমে তলিয়ে যাবার সময় একজন কাউকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মোবারক সাহেব অস্ফতি বোধ করছেন। কী একটা জিনিস যেন তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। টেপী নামের মেয়েটির শরীরের গন্ধ? হতে পারে। মানুষ চলে যায় কিন্তু সে তার গায়ের গন্ধ রেখে যায়। এই গন্ধ মোবারক সাহেবের পরিচিত— খুবই পরিচিত। এই জন্মেই কি তাঁর অস্ফতি লাগছে?

কী বিশ্বী নাম মেয়েটাৰ! নাম বদলে দিতে বলতে হবে— মেয়েটাৰ জন্মে সুন্দর একটা নাম দরকার— ময়ূরাঞ্চী নামটা কেমন? ময়ূরের মতো চোখ। ময়ূরের চোখ কি সুন্দর? তিনি আনেন না। ময়ূর দেখেছেন কিন্তু ময়ূরের চোখের দিকে বিশেষ করে তাকিয়ে দেবেন নি। যানুমের চোখের তুলনা মানুমের চোখের সঙ্গেই হওয়া উচিত— পাখির চোখের সঙ্গে নয়। গন্ধটা নাকে লাগছে। মোবারক সাহেব পাশ ফিরিলেন।



ন'টা থেকে মুখে মেকআপ নিয়ে রেশমা বসে আছে। ইটারকাটে তার একটা ক্রোজআপ যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এক্সট্রাদের ক্রোজআপ কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয় না। মূল শটগুলো ঠিকঠাক রাখার জন্যে এক্সট্রাদের দু'একটা ক্রোজআপ মাঝে মাঝে চলে আসে।

চোরাকারবারিদের আন্তর্নার সেট পড়েছে। নায়ক ফরহাদ চোরাকারবারিদের হাতে ধরা পড়েছে। তাকে একটা খাস্তার সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। আঙুল দিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। এই উপলক্ষে চোরাকারবারিদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে। মদ খাওয়া হচ্ছে। ফ্লোরে নাচের ব্যবস্থাও আছে। একদিকে ছবির হি঱ে আগন্তনে পূড়বে। অন্যদিকে নাচ চলবে। নায়ক ফরহাদের শট নেয়া হচ্ছে, চোরাকারবারিদের শট নেয়া হচ্ছে।

ফরহাদ সুপারহিট নায়ক। পরপর তিনটা ছবি তার হিট করেছে। বিজ্ঞাপনে তার স্পর্কে লেখা হয়— গ্যালাক্সি হিট রোমান্টিক হি঱ে— ফরহাদ খান।

সবার নজর হি঱ের দিকে। হি঱ের হাত বাঁধা বলে আসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজান এখন তাকে সিগারেট খাওয়াচ্ছে। দ্রুত সিগারেট ঠোটে ধরছে এবং ঠোট থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। ক্যামেরা রেডি করা আছে। হি঱ের সিগারেট খাওয়া শেষ হলেই শট নেয়া হবে। হি঱ে ‘ডায়ালগ’ বলবে। দীর্ঘ ডায়ালগ—

‘তোরা আমার শরীরকে ধরেছিস। আমার শরীর বন্দি, কিন্তু আমার মন? আমার মন মুক্ত বিহঙ্গীর মতো স্বাধীন। মনকে বন্দি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।’

হি঱ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, ‘ডায়ালগ কড়া, ক্ল্যাপ পড়বে। ভিত্তি বিহঙ্গী ফিহসী রিকশাওয়ালারা বুঝবে না— পাখি করতে হবে।’

ডাইরেক্টর আজমল তরফদার হাসিমুখে বললেন, ‘অবশ্যই হারামজাদা স্ক্রিপ্ট রাইটারের মাথার মধ্যে বুরে ডিকশনারি। বিহঙ্গ। বিহঙ্গ আয়োজক? মিজান ডায়ালগ ঠিক করে খাতায় লিখে ফেল। ফরহাদ ভাই আপনি রেডি?’

‘ইঁ।’

‘একটা মনিটার দিবেন নাকি?’

‘মনিটার লাগবে না। ডাইরেক্ট টেক।’

‘ওকে লাইটস।’

আলো জ্বল। হিরো বলল, ‘শটস কী রকম, ক্রোজআপ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ক্রোজআপ ভালো হবে না। সৎ শট থেকে ঝুম করে ফ্লেঞ্জে আসুন।’

আজমল তরফদার মনে মনে বললেন— হারামজ্জাদা এখন ডাইরেকশনে চলে আসছিস। শটের তুই বুঝস কি?

মনে মনে যা বলা হল মুখে তা বলা হল না। মুখে বলা হল— ‘ঠিক ধরেছেন ফরহাদ তাই। আপনার শট সেঙ্গ মারাত্মক। শাস্টি ভায়ালগে মুখের উপর ঝুম করে বিপ ক্রোজআপে চলে যাব— শুধু চোখ। কেমন হবে রে মিজানঃ?’

‘ভালো হবে ওষ্ঠাদ। শটের মতো শট।’

‘ঝুম লেস লাগা। ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ কর।’

ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ করে ঝুম লেস লাগাতে সময় লাগল। ঝুম লেস ছিল না। বাবি স্টুডিও থেকে ভাড়া করে আনতে হল। এই ফাঁকে অন্য শট দেয়া যেত। তার জন্মে আবার নতুন করে লাইটিং। সেটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হল— গ্যালাক্সি হিরো প্রতিটি শটে নাক গলাবেন। দরকার কি? তাঁর শট না নিয়ে অন্যের শট নিলে তিনি রাগও করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়েছে একনাগাড়ে তাঁর কাজ শেষ করে আনা কাজ ধরা হবে।

গ্যালাক্সি হিরো বললেন, ‘ঝুম লেস আনতে দেরি হবে?’

আজমল তরফদার হাই ভুলতে ভুলতে বললেন, ‘না দেরি হবে না।’

‘এইসব আপনারা আগে ব্যবহৃত রাখেন না শেষ সময়ে দৌড়াদৌড়ি।’

অপমানসূচক কথা। তবে গ্যালাক্সি হিরোর এ ধরনের অপমান গায়ে মারতে নেই। দুধ দেবে পর্ক লাবি দেবে, গায়ের উপর পেছব করে দেবে। জগতের এই হল নিয়ম। তবে দিন আসবে— তখন এই হিরোকেই মুখে রং মেখে সারাদিন বসে থাকতে হবে— কখন শটের জন্যে ভাক পড়ে। খুব সহজে সেই ভাক আসবে না।

‘হাতের বাঁধন খুলে দিন বিশ্রাম করি।’

ডাইরেক্টর সাহেবের ইঙ্গিতে ফ্লোর-বয় হাতের বাঁধন খোলার জন্যে ছুটে গেল। হিরো বিরক্ত মুখে বললেন, ‘কফি দিতে বলেন— নরম্যাল না, এক্সপ্রেসো। ইস্টার্ন প্রাইম ভালো এক্সপ্রেসো পাওয়া যায়— একজন কাউকে পাঠিয়ে দিন, কাছেই তো।’

ফ্লোর-বয় আরেকজন চলে গেল এক্সপ্রেসো কফির সঙ্গানে।

হিরো চেয়ারে পা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, ‘আজ আমাকে কেক্স সকাল সকাল ছাড়তে হবে— একটা জনাদিন আছে, যেতেই হবে। আজমল ভাই, মাইন্ড করবেন না, পরে পুরিয়ে দেব।’

আজমল তরফদার মনে মনে কুৎসিত একটা গালি দিলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। বিকেল চারটা প্রথম শিফট। ব্যাটা এগারটাৰ মধ্যে চলে গেলে কাজ কিছুই হবে না। শিফটের টাকা পুরোটাই যাবে।

‘আজমল ভাই মুখ বেজার করে বসে আছেন কেন?’

‘না বেজার হব কেন?’

‘আজ একটু আর্লি যাব ঠিকই কিন্তু পুরিয়ে দেব। দেখবেন টপাটপ কাজ নামিয়ে
দেব—‘বার্নিং সিন’ কি আজই হবে?’

আজমল তরফদার আবার হাই তুললেন। মনে মনে বললেন— ক অঞ্চল
শূকরমাস কিন্তু ইংরেজি বুলি বের হচ্ছে—‘বার্নিং সিন’— বার্নিং সিন আমি তোর পাছ
দিয়ে...

রেশমার সকাল থেকেই মাথাধৰা। কাল রাতে ঐ বুড়ো যখন চলে যেতে বলল,
তখনই বাগে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। সেই মাথাধৰা এখনো যায় নি। যতই সময় যাচ্ছে
ততই বাড়ছে। এখন মনে হয় জ্বর আসছে। তার শট হয়ে পেলে সে বাড়ি চলে যেতে
পারত। শট হবে না বলে মনে হয়। না হলেও ঝুত এগারটা পর্ফেন্ট বসে থাকতে হবে।
গরম এক কাপ চা খেলে মাথাধৰাটা কমত। প্রডাকশানের কাছে চা চাইলে পাওয়া যাবে
বলে মনে হয় না। এক্সট্রাদের ঘন ঘন চা দেবার নিয়ম নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে
পারে। চায়ের দায়িত্বে যে ফ্রেন-বয় রেশমা তার কাছে গিয়ে মধুর গলায় বলল, ‘সবুর
ভাই চা দেবেন? খুব মাথা ধরেছে।’

‘চা নাই।’

‘চা আছে। না বলছেন কেন? ছবির স্যাটিং চা ছাড়া চলে?’

সবুর বিরক্ত চোখে তাকাল। ফ্রেন-বয় রেশমা সাধারণত মেরুদণ্ড ছাড়াই জনপ্রিয় করে।
এক্সট্রার আশপাশে থাকলে মেরুদণ্ড ফিরে পায়।

‘দিন না এক কাপ চা, অসম্ভব মাথা ধরেছে।’

‘ক্যাটিনে গিয়া চা খাও।’

‘ভাহলে ক্যাটিনে চা খাওয়ার পয়সা দিন।’

‘ওরে বাপারে! ম্যাডামের মতো কথা।’

রেশমা ক্যাটিনে যাওয়াই ঠিক করল। কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে
পারছে না। তার শট এখন নেয়া হবে না এ বাপারে সে এক শ ভাগ নিশ্চিত। তারপরেও
প্রডাকশানের কারোর যদি চোখে পড়ে সে আশপাশে নেই অমনি মাথায় আগুন ধরে যাবে।
প্রডাকশান সব সময় রেগে থাকে— রাগ ঝাড়ার মানুষ দরকার। এক্সট্রার মেট্রু মানুষ।
রেশমা চিফ আসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজানের কাছে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল,
আমার শটটা কখন হবে? মিজান ভুঁক কুঁচকে তাকাল যেন এমন অসৌভাগ্যমূলক কথা সে
তার জীবনে শোনে নি।

‘দেরি হবে?’

‘জানি না।’

‘ক্যাটিন থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি মিজান ভাই? যাব আর আসব।’

মিজান জবাব দিল না। সে মুখ ভর্তি করে পান খাচ্ছিল। ফ্রেনের ভেতরই পানের
পিক ফেলল। এত কথা বলার তার সময় নেই।

‘যাব মিজান ভাই?’

মিজান বৈকিয়ে উঠল—‘সব সময় বিরক্ত করিস ক্যান? কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান না করলে ভালো লাগে না? কাজের সময় যন্ত্রণা!’

রেশমা সবে এল। ঝুম লেপ চলে এসেছে। কামেরায় মাউন্ট করানো হচ্ছে। হিরোর হাত খাশার সঙ্গে বাঁধা হচ্ছে। মেকআপ ম্যান চুল ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। চোরাকারবারিদের সঙ্গে ভয়কর ধরনের ধন্তাধন্তির পর সে ধরা পড়েছে। তাতে তার চুলের ভাঁজের কোনো ক্ষতি হয় নি। হিরোর শটে অনেক সময় লাগবে। এই ফাঁকে নিশ্চিন্ত মনে ক্যাটিনে চা খেতে যাওয়া যায়।

ক্যাটিনে গাদাগাদি শিড়। কলিজিয়ের গরম সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। দু'জন বয় সিঙ্গাড়া দিয়ে কূল পাছে না। রেশমা বসার জন্যে খালি চেয়ার খুঁজছে। দি রোজ মুভিজের আ্যাসিস্ট্যান্ট প্রতাকশান ম্যানেজার দিলদার থা হাত উঁচু করে আগ্রহের সঙ্গে ডাকল, ‘এই যে ম্যাডাম এসিকে আসেন।’

দিলদার থা আ্যাসিস্ট্যান্ট প্রতাকশান ম্যানেজার হলেও তার মূল কাজ মেয়ে মানুষের দালালি। ফিল্ম লাইনের মেয়েদের প্রতি বাইরের মানুষের আগ্রহ প্রচুর। ভালো অঙ্কের টাকা বরচেও এদের আগতি নেই। যোগাযোগটা সমস্যা। দিলদার থা এই সমস্যার সমাধান করে। ভালোমতোই করে। দু'পক্ষ থেকেই তার কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

দিলদার বলল, ‘ম্যাডাম কী খাবেন বলেন?’

‘কিছু না — চা।’

‘গুরু চা খাবেন কেন ম্যাডাম? আমার উপর রাগ করেছেন?’

‘ম্যাডাম ম্যাডাম বলবেন না তো দিলদার ভাই।’

‘মেয়েছেলে মাত্রই আমার কাছে ম্যাডাম। তা সে চাকরানিই হোক কিংবা নায়িকাই হোক। এই দেখি ম্যাডামকে দু'টা সিঙ্গাড়া দে।’

রেশমা সিঙ্গাড়া খাচ্ছে। খুব সাবধানে খেতে হচ্ছে যাতে ঠোটের লিপিটিক উঁচে না যায়। সিঙ্গাড়া খেতে গিয়ে সে টের পাছে তার খুব খিদে লেগেছে। প্রতাকশান থেকে সকালে ভালো নাশতা দেয়া হয়েছিল—কেক, চানাচুর, কলা, একটা মিষ্টি। ভারপৱেও এতটা খিদে থাকার কথা না।

দিলদার থা রেশমার কাছে ঝুঁকে এসে বলল, ‘প্রেম দেওয়ানা’র অ্যামি হচ্ছেঁ।

‘ছি।’

‘রোল কি?’

‘রোল কিছু না।’

‘কোনো ডায়ালগ আছে?’

‘দু'টা ডায়ালগ আছে।’

‘ফিল্ম লাইনে কতদিন হল?’

‘দু'বছর।’

BanglaBook.org

‘তাহলে তো চিন্তার কথা।’

‘চিন্তার কথা কেন?’

দিলদার খাঁ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ‘তোমার চেহারা সুন্দর, বয়স সুন্দর, কথাবার্তা সুন্দর, তিনি সুন্দর নিয়েও দু'বছরে যদি কিছু না হয় তাহলে আর হবে না। এক্ষেত্রে থেকে নায়িকার ছোটবোন, নায়িকার ছোটবোন থেকে নায়িকা। হয় না যে তা না, হয়। তবে দু'বছরের মধ্যে হয়। দু'বছরে না হলে— নো হোপ। দু'বছর পার করে দেবার পর ধরে নিতে হবে— এক্ষেত্রে হিসেবে রাইট ইন, এক্ষেত্রে হিসেবে লেফট আউট। হা-হা-হা।’

‘হাসছেন কেন? এটা তো হাসির কোনো কথা না।’

‘অবশ্যই হাসির কথা, শ্রীদেবীর মতো তোমার চেহারা। এই চেহারায় লাভ কী হল? এক্ষেত্রের পার্ট আর মাঝেমধ্যে ক্ষেপ মারা।’

‘আন্তে কথা বলেন দিলদার ভাই।’

‘আন্তেই তো বলছি। শোন ম্যাডাম বাইরের ক্ষেপ কমায়ে দাও— শ্রীরের সর্বনাশ হয়ে যায়। ফিলা লাইনে শ্রীরটাই আসল। ঘন ভেঙে গোলে কোনো ক্ষতি নাই, শ্রীর ভাঙলে সর্বনাশ।’

‘উঠিং দিলদার ভাই।’

‘উঠবে কি বস না, চা খাও আরেক কাপ।’

‘না, কাজ আছে।’

‘খাও খাও, আরেক কাপ চা খাও। ঐ ম্যাডামকে আরেক কাপ গরম চা।’

সে দ্বিতীয় কাপ চা নিল। দিলদার খাঁ আরো বালিকটা ঝুঁকে এল। বেশমা অস্বস্তি বোধ করছে। দিলদার খাঁর মূল কাজ যে দালালি এটা কারো অজ্ঞান নয়। তার কোনো মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলাব একটাই অর্থ।

দিলদার খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, ‘আমার বাসার ঠিকানা জান না?’

বেশমা ঠিকানা জানে না, তবু বলল জানে।

‘টেলিফোন নিয়েছি। টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রাখ। ইমার্জেন্সি টাকা-পয়সার দরকার হলে টেলিফোন করে দিও। আমার কাছে ভালো ভালো পার্টি আছে। সব ভদ্রলোক। একটাও দু'নম্বরী ভদ্রলোক না— আসল ভদ্রলোক। হাঁকি পাঁকি নাই।’

‘এইসব কাজ এখন আমি করি না দিলদার ভাই।’

দিলদার হাসল। পরক্ষণেই হাসি বন্ধ করে বলল, ‘না করাটা তো ভালো। তারপরেও ধর হঠাতে টাকা-পয়সার দরকার হয়ে গেল। টাকা তো আসমান থেকে পড়ে না। ব্যবস্থা করা লাগে। বর্তমানের ব্যবস্থা ছাড়াও ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে বাস্তুত হয়। আজ তোমার চেহারা আছে, শাশ্য আছে— দু'দিন পরে কি থাকবে? থাকবেনা। হঠাতে একটা বড় অসুস্থ হয়ে গেল। তখন? পানি পড়া মাগনা পাওয়া যায়, ওষধ লেগনা পাওয়া যায় না। খরিদ করা লাগে। কাগজ-কলম তোমার কাছে আছে?’

‘না।’

‘কাগজ-কলম আমার কাছেই আছে। টেলিফোন নাম্বার লিখে দিছি। যত্ন করে

যেখে দিপ। কখন দরকার হয়— কিছুই বলা যায় না।'

'টাটি দিলদার ভাই?'

'আচ্ছা। আমাদের প্রজাকশনের কাজ শুরু হচ্ছে। দেবি সেখানে তোমার জন্যে
ভালো কোনো সাইড রোল পাওয়া যায় কিনা।'

ফ্লোর ফিরে রেশমা হতভুর হয়ে গেল। শ্যাটিং প্যাকআপ হয়ে গেছে। আজমল
তরফদার শুকনো মুখে বসে আছেন। ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে বলে ক্যান ধূরছে না।
একজন ফ্লোর-ব্য ভাকে প্রবল বেগে তালের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। তারপরেও
আজমল তরফদার ঘামহেন। ইউনিটের সব লোকজন কেমন যেন গঞ্জীর। তারা
আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। শ্যাটিং প্যাকআপ হওয়ার মূল কারণ হল নায়ক ফরহাদের
সঙ্গে ডাইরেক্ট সাহেবের খিটিমিটি হয়েছে। নায়ক এক পর্যায়ে বলেছেন, এই ছবির কাজ
করব না। বলেই ফ্লোর থেকে বের হয়ে গাঢ়িতে উঠেছেন।

আজমল তরফদার ক্লাস্ট গলায় বললেন, 'আজ হোক কাল হোক, এই নথডামি যে সে
আমাদের সঙ্গে করবে এটা জানতাম। আমার সঙ্গে তার কেনো খিটিমিটি হয় নি, সে যা
বলেছে আমি শুনেছি। তার অন্যায় কথা শুনেও আমি বলেছি, ঠিক আছে— তারপরেও সে
ফ্লোর থেকে চলে গেল। ঘটনাটা কি? ঘটনা তোমরা কেউ জান না, জানি আমি। ঘটনা বলি
শোন— তার সাথে আমাদের ছবির কন্ট্রুট হয় দু'বছর আগে। এক লাখ টাকায় কন্ট্রুট।
এক লাখ টাকা পেয়েই সে তখন হাতে আসমানের চাঁদ পেয়েছে। খুশিতে ঝলকলা। এর
মধ্যে ঘটনা ঘটল— তার তিনটা ছবি হয়ে গেল সুপারহিট। এক লাখ টাকা থেকে বেড়ে
তার রেমুনারেশন এক লাফে হয়ে গেল চার লাখ। আমাদের সঙ্গে আগের চুক্তি— এক
শাখের চুক্তি। ব্যাটা গেছে ফেঁসে। এখন চাহে মোচড় দিয়ে আরো কিছু বের করে
নিতে— এই হচ্ছে ব্যাপার। প্রত্যক্ষরের অঙ্ক।'

মিজান বলল, 'আমরা এখন স্যার করব কি? টাকা বাড়াব?'

'দেবি।'

'যদি বলেন সম্ভাব্য পর ফরহাদ ভাইয়ের বাসায় শিয়ে হাতে— পায়ে ধরে ...।'

'কর যা ইচ্ছা।'

'আপনি সঙ্গে শেলে ভালো হয়— স্যার যাবেনঃ।'

আজমল তরফদার জবাব দিলেন না। তুরু কুঁচকে বসে রইলেন। শ্যাটিং প্যাকআপ
হবার পরেও কেউ যাচ্ছে না। বসে আছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত শিয়াল এখন বাজছে মাত্র
বারটা। সারা দিনের কাজ মাটি হবে— তা তো হয় না। নায়ক রাঙ্গাও তো অনেক কাজ
আছে। সেগুলো করা যায়।

ডাইরেক্ট সাহেবের রাগের মাথায় প্যাকআপ ব্রেক পরেও মিজান চোখের ইশারায়
বলেছে— প্যাকআপ না, সাময়িক বিরতি। অবস্থা ঠাণ্ডা হলে কাজ আবার শুরু হবে।
অবস্থা ঠাণ্ডা হল না। মিজান যখন ডাইরেক্ট সাহেবের কানে কানে বলল, 'লাখ ব্রেকের
পর কি স্যার ছোটখাটো দু'একটা কাজ করে ফেলব?' তখন আজমল তরফদার প্রচণ্ড ধর্মক

দিলেন—‘গাধার বাচ্চা, প্যাকআপ হয়ে গেছে তুই দেখছিস না? খালি বেশি কথা—সামনে থেকে যা। আমাকে কাজ শিখায়।’

মিজান কৃত্তিত থমকে কিন্তু ঘনে করল না। কৃত্তিত গালি, তুই ভুকাবি শুটিং ফ্লোর চলবে না তো কোথায় চলবে? শুটিং ফ্লোর তো আর শান্তিনিকেতনের আনন্দকূণ্ড না। মিজান একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। লাইটম্যানদের ইশারায় জানাল—শুটিং আসলেই প্যাকআপ। লাইট নামান্তে হচ্ছে। চারদিকে আনন্দময় ব্যঙ্গতা।

রেশমার বুক ধক ধক করছে। তার মন বলছে আজ পেমেন্ট হবে না। গতকাল দু'শিফট কাজ হয়েছে। পেমেন্ট হয় নি—বলা হয়েছে আজকের কাজ শেষ হলে একসঙ্গে পেমেন্ট। আজ যে অবস্থা তাতে পেমেন্টের কোনো সন্তান সে দেখছে না। জয়দেবপুর ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই। দু'দিন হল যবে চাল নেই। আশপাশের দোকান থেকে ধারে আনার উপায় নেই। সবাই টাকা পায়, ধার কেউ দেবে না। তারপরেও সে তিন কেজি চালের ব্যবস্থা করেছিল। আজ টাকা নিয়ে ফেরার পর এক সন্তানের চাল-ভালের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। রেশমা মিজানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিজান বলল, ‘কী চাস?’

‘পেমেন্ট হবে না মিজান ভাই?’

‘উঁ।’

‘উ’ শব্দটার মানে কি রেশমা ধরতে পারছে না। ‘হ্যাঁ’ না ‘না’?

‘যুব অসুবিধায় আছি মিজান ভাই।’

‘আমরা কি যুব সুবিধায় আছি? বেআকেলের মতো কথাবার্তা বলিস কী জন্যে? ছবির বারটা বেজে গেছে আর তোর হল পেমেন্ট? টাকা দরকার ভালো কথা—তার সময়-অসময় আছে না!?’

‘বড় অসুবিধার মধ্যে আছি মিজান ভাই।’

‘অফিসে যা, অফিসে গিয়ে মূলশি সাহেবকে বল। এখানে কোনো পেমেন্ট হবে না। সব পেমেন্ট অফিসে।’

‘ম্যানেজার সাহেবকে একটু বলে দেবেন?’

‘আচ্ছা।’

‘মনে থাকবে মিজান ভাই?’

‘হঁ।’

রেশমা স্থিতির নিশাস ফেলল। গত মাসে ‘বিনাকা ষ্টোর’ থেকে যুব কায়দা করে বাজার করেছে। বিনাকা ষ্টোরের মালিক ইসমাইল সাহেবকে বলেছে, ‘চাচা আজ আমার একটা সুসংবাদ আছে। আমাদের লাষ্ট ছবিটা হিট করেছে তো—এই জন্যে সবাইকে বোনাস দেয়া হয়েছে।

ইসমাইল হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘ভালোই তো।’

‘আপনার দোকান থেকে তো শুধু ধারেই বাজার করি আজ নগদা-নগদি খরিদ। তুটান্তের মরিচের আচার আছে না। আজ তুটান্তের একটা মরিচের আচারও কিনব। আছে?’

ইসমাইল আবারো হই তুলে বগল, ‘হঁ।’ সে হাই না তুলে কোনো কথা বলতে পারে না।

চাল, ডাল, আটা, ভূটনের মরিচের আচার, সয়াবিন তেশ, চা, চিনি সব মিলিয়ে পাঁচ শ তিয়াভর টাকা। রেশমা বাজারের সব প্যাকেট একত্র করে দাম দেয়ার জন্যে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে—হতভুব চোখে ভ্যানিটি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইসমাইল সন্দেহজনক গলায় বলল, ‘কি টাকা ছুরি গেছে?’

‘না। আনতে তুলে গেছি। চাচা আমার সঙ্গে কাউকে দিয়ে দিন। বাসা থেকে নিয়ে আসবে। যাবে আর আসবে। আমি বিকশা ভাড়া দিয়ে দেব।’

ইসমাইল খানিকফণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল— কাল দিলেই হবে।

‘আমি স্টুডিওতে ধাবার সময় দিয়ে যাব। আমি সকল আটটার আগেই যাই—তখন দোকান খোলে না?’

‘দশটার আগে দোকান খুলি না।’

‘তাহলে ফেরার পথে দিয়ে যাব।’

‘আচ্ছা।’

রেশমা আর যায় নি। যাবে কীভাবে, হাত খালি। আল্লাহর অসীম মেহেরবানি ইসমাইল ভাব বাসা চেনে না। বাসা চিনলে লোক পাঠিয়ে দিত।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। রেশমা শুকনো মূখে বসে আছে বাণী কথাচিত্তের অফিসে। মিজান ম্যানেজার সাহেবকে রেশমার পেমেন্টের ব্যাগারে কিছু বলে নি। বাণী কথাচিত্তের ম্যানেজার মূলশি শুকনো মূখে বলেছে—ভ্যাটিজের পেমেন্ট এখন বন্ধ। স্যারের লিখিত অর্ডার ছাড়া পেমেন্ট হবে না। মূলশি কঠিন লোক— কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরলেও কিছু হবে না। তারপরেও রেশমা বসে আছে যদি মিজান ভাই চলে আসেন। ইউনিটের লোকেরা ফিলু অফিসে দিনের মধ্যে একবার আসেই।

মূলশি বলল, ‘খামাখা বসে আছ কেন চলে যাও।’

‘মিজান ভাই আমাকে থাকতে বলেছেন।’

‘তাহলে থাক।’

রেশমা মনে মনে হাসল। অভাব তাকে আর কিছু শেখাক বা না শেখাক একটা জিনিস শিখিয়েছে। সুন্দর করে মিথ্যা বলা শিখিয়েছে। ‘পৃথিবীতে সবচে সুন্দর করে মিথ্যা কারা বলে— অভাবী মানুষেরা। সবচে সুন্দর অভিনয় কারা করে? অভাবী মানুষেরাই করে। সারাঙ্গণ তাদের অভিনয় করতে হয়। প্রচণ্ড দুর্শিষ্ঠা নিয়ে রেশমা অলঙ্ঘন করছে অর্থে সে তার মুখ হাসি হাসি করে রেখেছে। এই অভিনয় মোটেই সহজ লাজিনয় না।

রাত আটটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়। আটটা বাজতে মুশ্রমিনিট বাকি। মূলশি বলল, ‘কই মিজান সাহেব তো এগেন না।’

রেশমা উদ্ধি গলায় বলল, ‘আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না। মিজান ভাই বললেন, সন্ধ্যার পর অফিসে চলে এস জরুরি কথা। তুলে গেলেন কিনা কে জানে। সন্ধিবত তুলে গেছেন।’

সে উঠে দাঢ়ান। অবদেবপুর ফিরে খাবার বাস ভাড়া তার কাছে নেই। সেটা সমস্যা না। তার মতো ক্লিপবতী মেয়ে যদি কভারকে নরম পলায় বলে ভাড়া নাই কভারকে কিছু মনে করবে না। তবে এদের কাছে সত্য কথা বলতে হবে। এদের কাছে বাসিয়ে কোনো গন্ধ বলা যাবে না। একজন অভিবী মানুষ অন্য একজন অভিবী মানুষের অভিনয় চট করে থবে ফেলে। বাসের কভারকেও অভিবী লোক।

আকাশে মেষ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। বেশমাকে মগবাজার বাসস্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে। সে মনে ঘনে চাইছে বৃষ্টি নামুক। তবে এখন না। বাসে ঝঠার পর বুম বৃষ্টি নামুক। সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে জবজবা হয়ে বাসায় যেতে চায়। গরমে ঘামে গা ঘিনঘিন করছে।

মানুষের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা বোধহয় সব সময় প্রবণ হয়। বাস থেকে নেমেই বেশমা বৃষ্টি পেয়ে গেল। ভালো বৃষ্টি। বিকশাওয়ালারা ঘটো বাসিয়ে আসছে, আসুক, বিকশায় ঝঠা যাবে না। প্রথমত টাকা নেই, দ্বিতীয়ত ইচ্ছা করছে না। বৃষ্টিতে ভিজতেও খুব যে আরাম লাগছে তা না। বৃষ্টির ফোটাঞ্জলো ধারালো বলে মনে হচ্ছে। কেমন ফেল পায়ে বিধে যাচ্ছে। কিছু কিছু বৃষ্টি নরম করে গায়ে পড়ে, কিছু কিছু বৃষ্টি ধারালো বালির কণার মতো শরীরে বিধে যায়। এ রকম কেন হয় কে বলবে?

বাসার কাছাকাছি এসেই বেশমা তার শরীর থেকে ছবির নাম মুছে মিতু হয়ে গেল। এখন সে আর বেশমা না, এখন সে মিতু।

বাসার বারান্দায় মোড়ার উপর মিবিন ভাই বসা। তাঁর পাশে মিতুর বোন বুমুর। গালে হাত দিয়ে গল্প শুনছে। বুমুর মিতুকে দেখে নি। মিবিন প্রথম দেখল এবং আঙ্গুল উঁচিয়ে বুমুরকে দেখাল। বুমুর উঠে দাঢ়ান, খুশি খুশি গলায় চেঁচাল — আপা চলে এসেছে, আপা। বুমুরের চিংকার শব্দে তার মা শাহেদা এসে দরজায় দাঢ়ালেন। তাঁর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল। তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে নরম গলায় বললেন, ‘ভিজে কী হয়েছিস? ভিজলি কেন? রিকশা নিয়ে চলে এলেই হত।’

মিতু মিবিনের দিকে তাকাল। মার সামনে এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা লাগে। আগে যখন আপনি করে বলত তখন লজ্জা লাগত না। এখন তুমি তুমি করে বলে বলেই লজ্জা লাগে। মিতু বলল, ‘তুমি কখন এসেছ?’

মিবিন জবাব দিল না। মুখ টিপে শাসল। বুমুর বলল, ‘মিবিন ভাইয়া’ বিকলে এসেছে। আমি বললাম, আপার আজ সেকেন্দ শিফট পর্যন্ত শাচিং, বারচার আগে আসবে না। মিবিন ভাইয়া বলেছে অবশ্যই সে আটোর আগে চলে আসবে। উনার কথাই ঠিক হল। আপা তুমি কাপড় বদলে আস। শীতে কাপছ।’

মিতু কাপড় বদলাতে গেল। শাহেদা বাথক্ষের পাত্র তোয়ালে হাতে দাঢ়িয়ে আছেন। তিনি চাপা গলায় বললেন, ‘মিবিন আজ বাস্তুর দিজার করে নিয়ে এসেছে।’

‘কেন?’

‘জানি না কেন? দু’ কেজির মতো পোলাওয়ের চাল, খাসির মাখস, বাটারঅয়েল। আমাকে বলল, মা আপনার হাতে পোলাও-কোরমা থেকে ইচ্ছা করছে।’

‘রেঁধেছ পোলাও-কোরমা?’

‘ই। ঘরে আদা, গরম মসলা কিছুই নাই ... তুই তো টাকা-পয়সাও দিয়ে যাস নি।’

‘গরম মসলা হাড়াই কোরমা রেঁধেছ?’

‘না। মবিন বলল, আর কী কী জাগবে আমি তো জানি না— একটা কাগজে লিপ্ত
করে দিন নিয়ে আসি। বুদ্ধিমান ছেলে, আমাদের অবস্থা যে জানে না তা তো না।’

‘তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দাও মা, প্রচণ্ড বিদে লেগেছে।’

‘তুই কি টাকা-পয়সা কিছু এনেছিস?’

মিতু জবাব দিল না। টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে কিংবা টাকা-পয়সা নিয়ে
ভাবতে এই মহুর্তে ভালো লাগছে না। শাহেদা চাপা গলায় বললেন, ‘ও তোর জন্যে কী
জানি এনেছে। হঠাতে এইসব কী বুবলাম না।’

শাহেদা না বুঝলেও মিতু বুঝেছে। আজ ১৮ তারিখ তার জন্মদিন। বাসায় কারোর
মনে নেই— তার নিজেরও মনে নেই কিন্তু মবিন ভাইয়ের ঠিকই মনে আছে। এই এক
উপলক্ষ ধরে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। মিতু তোরালে
দিয়ে ভিজে চুল জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মবিন একা একা বসে আছে। তাকে
কেমন রোগা রোগা লাগছে। মিতু হাসিমুখে বলল, ‘তুমি নাকি আমার জন্যে কী উপহার
এনেছ— মা বলল।’

‘ইঁ।’

‘কই উপহারটা দাও।’

‘বুমুরের কাছে দিয়েছি।’

‘জিনিসটা কী? বই?’

‘উঁ। একটা শাড়ি। কমদামি জিনিস, সুতি শাড়ি। রঙটা বুব মনে ধরল।’

‘কী রং?’

‘জমিনটা হালকা বেগুনি, পাঢ় সবুজ।’

‘কালো মেয়েদের জন্যে কখনো বেগুনি রং কিনতে নেই। বেগুনি রঙে কালো
মেয়েদের আরো কালো দেখায়। বেগুনি রং আশপাশ থেকে রং শষে নেয়।’

‘এসব জান কীভাবে?’

‘আমাদের মেকআপ ম্যান, তার কাছে শুনেছি।’

‘আজ তোমাদের শাটিং ক্যানসেল হল কেন?’

‘নানান কারণ। অন্য কথা বল— তোমার সঙ্গে ছবির গুরু করতে ভালো লাগে না।
চাকরি টাকাবির কোনো ধরণ পেয়েছে?’

‘না।’

‘বাজার, উপহার এসব দেখে ভাবলাম হয়তো কিছু শয়ে গেছ।’

‘ধখনো পাই নি।’

‘ভাহলে কুরছ কী?’

‘আগে যা কুরতাম, তাই কুরছি— জন্মের ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি জ্ঞান ফেরি করে
বেড়াছি। প্রাইভেট টিউশ্যানি।’

‘চাকরির ইন্টারভু দেখা কি বক্ত করে দিয়েছ?’

‘না। এখনো দিচ্ছি। আমার ধৈর্য আমার দুর্ভাগ্যের মতোই সীমাহীন।’

‘বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না। আমার খুবই বিশেষ নাগে। যা বলার সহজ সাধারণ ভাষায় বলবে।’

‘আচ্ছা বলব।’

মিতু মরিনের পাশে রাখা মোড়ায় বসতে বসতে বলল, ‘তুমি জ্ঞানের ফেরিওয়ানা হয়ে যা রোজগার কর তাতে তোমার নিজেরই চলে না, তাৰ উপৰ দেশে টাকা পাঠাতে হয়— এই অবস্থায় শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ কৰা খুব অন্যায়।’

মরিন হালকা গলায় বলল, ‘ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে ...’

‘তোমাকে না বললাম বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না।’

‘দিনবাত বই পড়তে পড়তে নিজে ঝালিকটা বইয়ের মতো হয়ে গেছি। শুক্র কাট্টং।’

‘এই যে এত ইন্টারভু দিচ্ছ — কোথাও কিছু হচ্ছে না?’

‘প্রতিবারই হচ্ছে হচ্ছে একটা ভাব হয়, তাৰপৰ হয় না।’

‘সেটা আবার কেমন?’

‘দিন কুড়ি আগে চাকরির একটা ইন্টারভু দিলাম। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার বাইরের পড়াশোনা তো বেশ ভালো। কোয়াইট ইলেক্ট্রিসিটি। আপনার ইন্টারভু নিয়ে ভালো লাগল। এই পর্যন্তই। চাকরি হয় নি।’

‘একদিন নিশ্চয়ই হবে।’

মরিন হাসল। সুন্দর করে হাসল। অস্বকারে তাৰ হাসিমুখ দেখা গেল না। শিতুৰ ঘনে হল—দেখা না যাওয়াটাই ভালো। মানুষটার হাসিমুখ এত সুন্দর। দেখলেই বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

বুমুৰ এসে বলল, ‘মরিন ভাই যেতে আসুন।’

মরিন উঠে দাঢ়াল।

মেৰেতে পাটি বিছিয়ে খাবার আয়োজন। মরিনকে ঘাঁথখনে রেখে দু’ বোন দু’ পাশে বসেছে। শাহেদা খাবার এগিয়ে দিছেন। মরিন তাঁৰ দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা আপনি খাবেন না?’ সুন্দর করে মা ভাকল, কিন্তু শাহেদার সেই মা ভাক ভালো লাগল না। ছেলেটা ভালো। খুবই ভালো। তাঁৰ বড় ছেলে রাফিকের প্রিয় বন্দুদের একজন। তাঁকে দেখলেই রাফিকের কথা মনে হয়। কিন্তু শাহেদার এই ছেলেকে পছন্দ না। অগভেজে কাৰণও তিনি জানেন না।

মরিন বলল, ‘মা আপনিও আমাদের সঙ্গে কমুন।’

শাহেদা বন্দের মতো বললেন, ‘তোমরা খাও। বাতে কুমি কিছু খাই না। অস্বল হয়।’

বুমুৰ বলল, ‘মরিন ভাই যেতে যেতে ঐ গৱাটা আঘাতৰ বলুন না। সবাই জুক।’

‘কোন গৱাটা?’

‘জনী ভূতেৰ গৱাটা—আপা তুমিও শোন— তয়ৎকৰ হাসিৱ। হালতে হাসতে বিষম

থাবে। তৃতীয়া তো সাধারণত খুব বোকা হয়— ঐ ভৃত্যটা ছিল বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী।
বৰীন্দ্ৰনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসের প্রথম ছাপিশ পৃষ্ঠা তাৰ মুখস্থ ছিল।

শাহেদা বিৰক্ত গলায় বলগৱেন, ‘থাওয়াৰ সময় এত গুৱি? চুপচাপ থেয়ে যা। মিবিন
থেতে পাৱছ? থেতে কেমন হয়েছে?’

‘খুব ভালো হয়েছে মা। হোটেজের কুৎসিত খাবাৰ থাই। পোলাও-কোৱাৰ অমৃতেৰ
মতো লাগছে।’

বুমুৰ বলল, ‘মিবিন ভাই অমৃত থেতে কি পোলাও-কোৱাৰ মতো?’

মিবিন হাসিমুখে বলল, ‘না। অমৃত থেতে মিষ্টি।’

‘এমন ভাবে বললেন ফেন আপনি অমৃত থেয়ে দেবেছেন।’

শাহেদা আবাবো বিৰক্ত গলায় বলগৱেন, ‘থাওয়াৰ সময় এত কথা কেন?’

থাওয়া শেষ কৱে মিবিন বারান্দায় বসে আছে। খুব জোৱেশোৱে বৃষ্টি নেমেছে।
মিবিনেৰ পাশে বুমুৰ বসে আছে। সে চোখ বড় বড় কৱে গুঁজ শুনছে।

শাহেদা ভয়ে পড়েছেন। তাঁৰ শৰীৰ ভালো লাগছে না। মিতু রান্নাঘৰে চায়েৰ পানি
বসিয়েছে। চায়েৰ দুধ নেই। রং চা বানাতে হৰে। মিবিন রং চা থেতে পাৰে না। বুমুৰ
এসে পাশে বসল— চাপা গলায় বলল, ‘আপা। কী রকম বুম বৃষ্টি নেমেছে দেবেছে?’

‘হঁ।’

‘মিবিন ভাই এ রকম বুম বৃষ্টিৰ মধ্যে যাবে কীভাবে?’

‘তিঙ্গতে তিজতে যাবে, আৱ কীভাবে যাবে।’

‘আজ আমাদেৱ বাসায় থেকে যাক না। অনেক বাত পৰ্যন্ত আমৰা তিনজন মিলে গুৱ
কৱব।’

‘থাকবে কোথায়?’

‘বসার দৰে বিছানা কৱে দেব।’

‘ও রাজি হবে না।’

‘বললেই রাজি হবে। বলে দেখব আপা?’

‘দেখতে পাৰিস।’

বুমুৰ ছুটে চলে গেল। উৎসাহে তাঁৰ চোখ ঝলমল কৱছে। মিতু ছোট নিষ্ঠাপ্ত কফেলে
কাপে চা ঢালছে। সে জানে মিবিন রাজি হবে না। এইসব ব্যাপারে সে তয়দৰ্বু সাবধান।

মিতু চা নিয়ে বারান্দায় গেল। বুমুৰ কৰুণ গলায় বলল, ‘আপা, মিবিন ভাই থাকতে
রাজি হচ্ছে না। তুমি একটু বলে দেখ না।’

মিবিন চায়েৰ কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, ‘তোমার অপো বললেও রাজি হব না।’

‘বৃষ্টিতে তিজে অসুখ বাধাবেন?’

‘হঁ, অনেক দিন অসুখ বিসুখ হচ্ছে না। একটা অসুখ বাধাতে ইচ্ছা কৱছে।’

চা শেষ কৱে বৃষ্টিৰ মধ্যেই মিবিন নেমে গেল। দৰে কোনো ছাতা নেই। মিতুৰ
মনটা খারাপ লাগছে। একটা ছাতা ধাকলে বেচারাকে দেয়া যোৱে।

দু' বেন বারান্দায় বসে আছে। ঝুমুর বলল, 'মিন ভাই নামল আর কী বৃষ্টিভাই শুন
হল—আপা দেখলে?'

'ই।'

'অসুখ অসুখ করছিল। এখন সে নির্ধাত অসুখে পড়বে।'

'পড়ুক।'

'আপা উনি যে তোমার জন্যে শাড়িটা এনেছেন সেটা পরবে?'

'রাতদুপুরে নতুন শাড়ি পরব কেন?'

'পর না দেখি কেমন লাগে। পিলজ।'

'গুধু গুধু বিরক্ত করিস না তো ঝুমুর। অচও মাথা ধরেছে। আমি এখন শুয়ে পড়ব।'

'বেচারা শখ করে এনেছে পর না।'

'পরলো কী হবে? ও তো আর দেখবে না।'

'না দেখুক। তুমি তো জানবে—সে তোমার জন্যে কট্টেষ করে একটা শাড়ি এনেছে
—তুমি সেটা পরেছ।'

'ওই শাড়ি আমাকে ঘানাবে না। বেগুনি রঙের শাড়ি, আমি কালো একটা মেয়ে।'

'পিলজ আপা পিলজ।'

'ঝুমুর তোর খুব বিরক্ত করা স্বত্ত্বাব হয়েছে। এক লক্ষবার পিজ বশলেও আমি এখন
শাড়ি পরব না।'

'অ-ব-বেন হাঁচি হনে হচ্ছে তুমি প্রত্যেক

'আয় শুয়ে পাঢ় রাতদুপুর পর্ফেন্ট বরপ্সায় বসে ধূধায় কোনো শান্তি নাই।'

'আরেকটু বসি আপা।'

'তুই বসে থাক। আমি শুয়ে পড়ি।'

'ও আপা একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিকেলে এক ভদ্রগোক এসে তোমাকে
একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।'

মিতু বিশিত হয়ে বলল, 'কী চিঠি?'

'আমি কী করে বলব কী চিঠি? খামে বন্ধ। আমি খাম ঝুলি নি।'

খাম খুলে মিতু চারটা চকচকে পাঁচ শ টাকার নোট পেল। কোনো চিঠি নেই শুধুই
টাকা। টাকাগুলো সে শোবারক সাহেবের বাড়িতে ফেলে এসেছিল।

ঝুমুর অবাক হয়ে বলল, 'এত টাকা কীসের আপা?'

মিতু ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল।



মোবারক সাহেবের হোটেলের ঘর আকাশের কাছাকাছি। একশিতলার ৮৩৩ নম্বর রুম। জানালা খুললে ঝমের তেতর মেঘ ঢুকে পড়বে। তবে জানালা খোলার ব্যবস্থা নেই। ঝমের সঙ্গে বারান্দার মতো আছে— বারান্দাও থাই এন্টিমিনিয়ামে ঢাকা। এখানে দাঢ়ালে টোকিও শহরের খানিকটা দেখা যায়। সবচে' ভালো দেখা যায় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়ে। প্রতি মিনিটে একটা করে ফ্লেন উঠছে-নামছে। ফ্লেন যে এমন বাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে মোবারক সাহেবের ধারণা ছিল না। বেশ খানিকক্ষণ তিনি বারান্দায় দাঢ়িয়ে ফ্লেনের উঠানামা দেখে এই সিন্কান্টে এনেন যে উড়ার সময় ফ্লেনগুলো বাজকীয় ভঙ্গিতে উড়লেও নামার সময় ভয়ে ভয়ে নামে।

হোটেলে বারান্দার এই অংশটির নাম বিজনেস কর্মার। পারসোনাল কম্পিউটার, ফ্লাঙ্ক মেশিন, লেখার চেয়ার-টেবিল সবই আছে। লেখার টেবিলের এক কোণায় কফি পার্কোলেটের আগুনগরম কফি। মূল লেখার টেবিলের এক কোণে ছেট টিভিতে সিএনএন-এর খবর দেখাচ্ছে।

বারান্দার এই অংশে সিগারেট খাওয়া যাবে এ বক্তব্য একটা মোটিশ ঝুলছে। নো স্পোকিং সাইন ঝুললে সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয় কিন্তু সিগারেট খাওয়া যায় এ জাতীয় নোটিশ দেখলে সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে না।

আজ রোববার। ছুটির দিন। মোবারক সাহেবের কাজকর্ম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছুই আজ করার নেই। শহরে ঘুরে বেড়ালো বা শপিং করার প্রয়োগ আসে না। একটা স্মিল্টি ব্যাস পর্যন্ত এইসব ভালো লাগে— তারপর ভালো লাগে না। তাছাড়া জাপানে ভাঁড় দেখার নতুন কিছু নেই। তিনি আরো খানিকক্ষণ ফ্লেনের উড়াভাড়ি দেখলেন। আজ সন্তাদিন কী করবেন তার একটা তাপিকা মনে মনে করলেন।

রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। কথা না বললেও হয়— বললে ক্ষতি নেই। জীবনে যতবার দেশের বাইরে এসেছেন ততবারই স্মৃতি সঙ্গে জন্মত একবার হলেও টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। তিনি অসংখ্যবার দেশের বাইরে পেছেন— রেহানা কখনো তাঁর সঙ্গে আসে নি। রেহানার আকাশতীতি আছে। ছোটবেলায় তাঁর হাত দেখে কে নাকি বলেছিল তাঁর মৃত্যু হবে আ্যাকসিডেন্টে। রেহানার ধারণা সেই আ্যাকসিডেন্ট হবে

আকাশে।

রেহনাকে টেলিফোনের পর চিঠি লেখা যেতে পারে। বাইরে এসেই তাঁর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে কিন্তু চিঠি লিখবে কাকে? তাঁর চিঠি লেখার কেউ নেই।

বই পড়া যায়। ভূতের বইটা সঙ্গে এনেছেন— প্রথম গল্পটা মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়া হয়েছে। গল্পের শেষটা কেমন দেখা যেতে পারে। সুন্দর করে শুন্দর করা গল্পের শেষটা সাধারণত খুব এলোমেলো থাকে।

মোবারক সাহেব কাপে কফি ঢাললেন। চা-কফি এইসব পানীয় নিজে ঢেলে যেতে ভালো লাগে না। অন্য কেউ বানিয়ে হাতে তুলে দিলে ভালো লাগে। টেপী মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভালোই হত। এই মুহূর্তে কফির কাপ হাতে তুলে দিতে পারত। ছুটির দিন ছিল। ছুটির দিনে সঙ্গে নিয়ে ঘূরতেন। যা দেখত তাতেই বিশ্বে অভিভূত হত। সেই বিশ্বের দেখতে ভালো লাগত। নিজের বিশ্বিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে অন্যের বিশ্বিত ক্ষেত্র দেখতে ভালো লাগে। মেয়েটিকে জনায়াসে নিয়ে আসা যেত। শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাদ দিলেন— তবে মেয়েটি সম্পর্কে বৌজৰবৰ শোকমানকে পাঠাতে বলেছিলেন। শোকমান ফ্যাক্স গতকাল পাঠিয়েছে। তাঁর পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে নি। এখনো করছে না। যখন করবে তখন পড়ে দেখবেন।

কফি যেতে ভালো হয় নি। কিংবা হয়তো ভালোই হয়েছে। তাঁর নিজের ভালো লাগছে না। ভালো লাগা এবং মন লাগার ব্যাপারটা তাঁর খুব তীব্র। যা ভালো লাগে না, হাজার চেষ্টা করেও তাকে আর ভালো লাগাতে পারেন না। যখন বয়স কম ছিল তখন ভালো লাগাতে চেষ্টা করতেন। এখন তাও করেন না।

রেহনাকে বিয়ের বাতেই তাঁর ভালো লাগে নি। পুতুল পুতুল টাইপের একটা মেয়ে। আমনায় জুবরাঙ্গ হয়ে থাটের এক কোনায় জড়েসড়ে হয়ে বসে ছিল। ঘরে চুক্তেই তাঁর গোলাপ ফুলের পক্ষে মাঝা ধরে গেল। দুনিয়ার গোলাপ দিয়ে বাসর ঘর সাজিয়েছে। একটা গোলাপের দ্বার সহ্য করা যায় কিন্তু এক লক্ষ গোলাপের দ্বার সহ্য করা যায় না। তাঁকে চুক্তে দেখেই রেহনা মুখ তুলে তাকাল। সুন্দর মুখ। গোলাপুর সুরী সুরী চেহারা, বড় বড় চোখ। তারপরেও মোবারক সাহেবের ভালো লাগল না। তিনি ভালো লাগার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, ‘কেমন আছ রেহনা।’

নববধূ নড়েচড়ে বসল, জ্বাব দিল না।

‘কী গরম পড়েছে দেখেছ? গরমে ফুল পক্ষে বিশ্বী গন্ধ ছাড়ে তাই না?’

রেহনা বলল, ‘ছিঁ।’

অথচ বাসর ঘর মোটেই গরম ছিল না। শীতকালে বিয়ে হচ্ছে তারপরেও বাসর ঘরে এয়ারকন্সার চলছে। মাথার উপর হালকাতাবে ফ্যান চুরাছে প্রজনি নববধূর পাশে বসে হাই তুললেন। বাসর ঘরে নববধূর পাশে বসে খুব কম প্রস্তুত হাই তোলে। তিনি সেই কমসংখ্যক পুরুষদের দলে। রেহনা আশপাশে থাকল এখনো তার হাই তোলে। টেলিফোনে যখন তার সঙ্গে কথা বলেন তখনো হাই তোলে।

মোবারক সাহেব হোটেলের বারান্দা থেকে শোবার ঘরে ঢেলে এলেন। রেহনার সঙ্গে টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। দেশ থেকে আসা ফ্যাক্সগুলো দেখবেন। ভূতের

বইটা পড়বেন। না, গোটা বই না, প্রথম গল্পের শেষটা। আজ দিনটা শয়ে বসে কাটানো। কাল অনেক কাজ। কাজে সাহায্য করার জন্যে তিনি সঙ্গে কাউকে আনেন নি। যা করার তাকে একা করতে হবে। একজন কাউকে নিয়ে এলে হত। কাজে সাহায্য না হোক কথা বলা যেত। মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষের সবচে' বড় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না— সলিটারি কলফাইনমেন্ট। নিঃসঙ্গ নির্বাসন।

‘হালো রেহানা?’

‘ওমা, তুমি!’

‘কেমন আছ রেহানা?’

‘আশ্চর্য, তুমি ফট করে জাপান চলে গেলে। আগে তো কিছুই বল নি। আমি ইদরিসকে টেলিফোন করলাম— ইদরিস বলল, স্যার জাপানে। আমি বললাম— কোথায় আছে টেলিফোন নাম্বার দাও। ও দিল না। বলল, সে জানে না। আমি নিশ্চিত সে জানে, তবু দিল না। তুমি কি ওকে বলেছ আমাকে টেলিফোন নাম্বার না দিতে?’

‘না।’

‘তাহলে দিল না কেন?’

‘বুঝতে পারছি না কেন দিল না।’

‘তুমি অবশ্যই ওকে কঠিন ধর্মক দেবে। কী আশ্চর্য আমি টেলিফোন নাম্বার চাইলাম, ও দিল না। মিথ্যা কথা বলল...’

‘রেহানা, তুমি কেমন আছ সেটা তো বললে না।’

‘ভালো না। কাল সারারাত এক ফোটা ঘূম হয় নি। রাত এগারটার সময় ঘূমতে গেছি তখনি ঘনে হয়েছে ঘূম হবে না। কান্তাকে টেলিফোন করলাম— কান্তা বলল, মাথায় পানি ঢেলে, এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকতে। মাথায় পানি ঢাললাম কিন্তু গরম দুধ আর খুঁজে পাই না। চায়ের জন্যে কনডেসড মিঙ্ক ছাড়া ঘরে দুধ নেই। কলমা করতে পার? শেষে ডিপ হিঙ্গে এক প্যাকেট দুধ পাওয়া গেল— জমে পাথরের মতো হয়ে গেছে। কলমা করতে পার? মাইক্রোওয়েভে দুধের পাথর গলাতে দিয়েছি— ওয়া সেটাও নষ্ট! এই দুধ গরম করে খেতে খেতে রাত বেজেছে দু'টা।’

‘গরম দুধ খাবার পরেও লাভ হয় নি?’

‘না। শেষ রাতের দিকে চোখের পাতা একটু বক্স হয়েছে— তখন শুধু দুচ্ছপ দেখেছি।’

‘তোমার সেই আ্যাক্সিডেন্টের দুচ্ছপ?’

‘না। আরো ভয়ংকর। স্বপ্নে দেখলাম আমার যে কাজের মেয়েটা করিমের মা, সে বাঁটি দিয়ে আমাকে কোপাছে।’

‘বশ কী?’

‘আমি যতই বলি—এই করিমের মা, এই, ততটাসে হাসে আর কোপ দেয়। যাই হোক সকালে ঘূম থেকে উঠেই তিন মাসের অ্যাডভল বেতন দিয়ে ওকে বিদায় করেছি। যেতে চায না— কান্নাকাটি করে— আমি পাত্তা দেই নি। এমনিতেই আমার রাতে ঘূম হয় না, তারপর যদি এরকম দুচ্ছপ দেখার পরেও তাকে রেখে দেই, সেটা কি ঠিক হবে?’

‘না, ঠিক হবে না।’

‘তুমি জাপান থেকে আমার জন্যে একটা বই নিয়ে এস।’

‘কী বই?’

‘স্প্রে ইন্টারিটেশনের একটা বই। কোন স্প্রে দেখলে কী হয়—এই বই।’

‘খবনামা জাতীয় বই?’

‘হ্যাঁ।’

‘এইসব বই আমাদের দেশের ফুটপাতে পাওয়া যাবার কথা। জাপানে কি পাওয়া যাবে?’

‘অবশ্যই পাওয়া যাবে। স্প্রে নিয়ে সারা পৃথিবীতে রিসার্চ হচ্ছে। স্প্রে তো তুচ্ছ করার বিষয় না।’

‘আচ্ছা আমি বই নিয়ে আসব। এখন টেলিফোনটা রাখি। জরুরি কোনো ফ্যাক্স এসেছে বলে মনে হচ্ছে। ফ্যাক্স মেশিনে শব্দ হচ্ছে।’

রেহানাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে মোবারক সাহেবে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি স্বত্ত্বাধি করছেন— কারণ রেহানা তাঁর কাছে টেলিফোন নাথার চায় নি। চাইতে ভুলে গেছে।

টেপীর সম্পর্কে লোকমান খোঁজ যা পাঠিয়েছে তাতে মোবারক সাহেবের বিশ্বের নীমা রইল না। মেয়েটির নাম টেপী নয়— মিতু। তার ছবির জগতের একটা নাম আছে— বেশমা। তারা তিনি বোন না, দু'বোন এক ভাই। ভাই জেলে আছে। সাত বছরের সাজা হয়েছে। বাবা চা বাগানে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বব্রহ্ম হারিয়েছেন। মিতু ইন্টারফিডিয়েটে পড়ার সময় তিনি মারা যান। মেয়েটির আর পড়াশোনা হয় নি।

লোকমানের পাঠানো রিপোর্ট সম্পূর্ণ না। মেয়েটি ছবির লাইনে কী করে এল রিপোর্টে এই তথ্য থাকা উচিত ছিল। মেয়েটির বাবা কীসের ব্যবসা করতেন? তাইয়ের সাত বছরের সাজা হয়েছে— মাঝলাটা কীসের? খুনের মামলা? অন্দ্র মামলা?

মেয়েটি অভিনয় ভালোই জানে — ক্ষমতে তাঁর সামান্য সন্দেহ হচ্ছিল মেয়েটি বাসিকতা করছে— শেষে তিনি মেয়েটির কথা বিশ্বাস করতে ক্ষম করেছিলেন। তিনি বোন হাপী, টেপী, পেপী। এই হাস্যকর ব্যাপারটি যে-মেয়ে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতে পারে তার অভিনয় ক্ষমতা তুচ্ছ করার মতো না।

মোবারক সাহেব দুগুরে কিছু খেলেন না। বরফের কুচি দেয়া এক প্রামাণ্যমেটের বস খেয়ে শুয়ে পড়লেন। গল্পের বইটি পড়ার চেষ্টা করলেন। যতই এক্সেক্সে গল্প ততই উন্মুক্ত হচ্ছে। ভূতের গল্প হিসেবে এইসব ছাইপাঁশ আজকাল লেখা হচ্ছে। শক্ষ লক্ষ কর্প ছেপে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনো মানে হয়?

ভুবাপেটে আরাম করে সুমানো যায় না। ইঁসফ্যান্স মালো। ক্ষিধে নিয়ে শয়েছেন বলেই বোধহ্য তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘূমুনেন। ঘূম ভাঙ্গল টেলিফোনের শব্দে। অফিস থেকে টেলিফোন। তিনি যতদিন বাইরে থাকবেন ততদিনই প্রতি সন্ধ্যায় টেলিফোনে তাঁর খোঁজখবর নেয়া হবে। ঢাকা অফিসের খবর তাঁকে দেয়া হবে।

টেলিফোন করেছে লোকমান। মোবারক সাহেব কোমল গলায় বললেন, ‘কেমন আছ
লোকমান?’

‘স্যার ভালো আছি। একটা ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম স্যার, পেয়েছেন?’

‘হ্যাঁ। ঢাকার খবর কি?’

‘দেয়ার মতো কোনো খবর নেই স্যার। সব ঠিকঠাক আছে।’

‘জুনের আঠার তারিখ মত্তা পোর্টে আমাদের যে জাহাজ আসার কথা সেটা ঠিক
আছে?’

‘স্যার এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। এডেন হয়ে আসবে, এডেনে কোনো সমস্যা না হলে
তারিখ মতোই আসবে।’

‘সমস্যা হবার কি কোনো সম্ভাবনা আছে?’

‘কিছি স্যার আছে।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। তাঙ্গো কথা একটা ছবি বানাতে কী পরিমাণ টাকা দাগে তুমি
জান?’

‘স্যার আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘ছবি বানাতে, টু মেক এ মূল লেখ ফিচার ফিল্ম কী পরিমাণ টাকা লগ্নি করতে হয়
তুমি কি জান?’

‘স্যার আমি জানি না, তবে আপনি বললে খোজ নিতে পারি।’

‘খোজ নিও তো।’

‘আমি স্যার এখনি খোজ নেব। খোজ নিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আপনাকে জানাব।’

‘তাড়া কিছু নেই— তুমি খোজ নিয়ে রাখ, এক সময় আমাকে জানালেই হবে।’

‘কিছি আচ্ছা স্যার।’

‘লোকমান আমি তাহলে টেলিফোন রাখি।’

টেলিফোন রেখে মোবারক সাহেব রাতের কর্মকাণ্ড মনে মনে ঠিক করে ফেললেন।
ক্যাব নিয়ে থানিকঙ্কণ ঘূরবেন। বইয়ের দোকানে যেতে হবে— স্বপ্ন তথ্য বিষয়ক বই
কিনতে হবে। তারপর একটা মেস্সেজিকান রেস্টুরেন্ট থেকে বের করতে হবে। ডিনারের সঙ্গে
মার্গারিটা খেতে ইচ্ছে করছে। মেস্সেজিকান রেস্টুরেন্ট ছাড়া এই পানীয় আর কোথাও পাওয়া
যায় না। জাপানি ক্যাব ড্রাইভাররা ইংরেজি জানে না বলেও হয়। হোটেলের
রিসিপশনিস্টদের সাহায্য নিতে হবে। বড় হোটেলের রিসিপশনিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে
তাঁর তাঙ্গো দাগে না। এরা যদ্দের মতো কথা বলে। আজ পর্যন্ত তিনি খাচ্ছেন হোটেলে
এমন কোনো রিসিপশনিস্ট পান নি যে মানুষের মতো কথা বলেছে।

এই হোটেলের রিসিপশনিস্ট মেয়েটি এমন সাজ সেজেছে যেন্তে একুনি বিশ্বসনীয়ী
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাবে। পাতলা ঠাঁটে যে সিপাসিজ দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে
ঠাঁটে আঙ্গুল ছুলছে। জাপানিস্ট তাঙ্গো ইংরেজি বলতে সারে না। কিন্তু মেয়েটি নির্ধৃত
আমেরিকান একসেন্টের ইংরেজিতে বলল, ‘স্যার আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?’

মোবারক সাহেব বিস্তৃতি ও বিত্তীক্ষা নিয়ে মেয়েটিকে দেখছেন। যদ্বা কথা বলছে—
মানুষ না। কঠিন কিছু বলে মেয়েটির যন্ত্র তাবকে নষ্ট করে দিলে সে হয়তো মানুষের মতো

কথা বলত।

‘স্যার কিছু কি করতে পাবি?’

মোবারক সাহেবের ইচ্ছা হল বলেন— ইয়াং লেডি, আমি খুব একা বোধ করছি। তুমি কি তোমার ডিউটি শেষ হবার পর রাতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসবে? তোমাকে আমি হ্যান্ডসমালি পে করব।

এ জাতীয় কথা বললে সে একটা ধাক্কা থাবে। তার রোবট ভাব এতে কাটিতে পারে।

মোবারক সাহেব তেমন কিছু বললেন না, মেঝিকান বেস্টুরেটের ঠিকানা চাইলেন। মেয়েটি দ্রুত ঠিকানা বের করে ফেলল। হাসিমুখে বলল, ‘আমি কি ক্যাব ঠিক করে তাকে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দেব?’

‘দিলে খুব ভালো হয়। ইউ আর সো কাইভ।’

‘পিঞ্জ ডেন্ট মেনশান।’

সব ধরাবাঁধা কথা। সব যন্ত্রের মতো কথা। যেন আগে থেকে প্রেরণা করা।

রেহানাও তো এরকম। সে কোনো পাচতারা হোটেলের বিসিপশনিষ্ট নয় কিন্তু সে যখন কথা বলে তখন সেও তো তার ধরাবাঁধা গঁৎ-এ চলে আসে। এর বাইরে যেতে পারে না। এর বাইরে কথা বলতে পারে না। আসলে সব হ্যান্ডই কি এ রকম নয়? তিনি নিজেও কি একজন রোবট না?

মানুষ রোবট কীভাবে হয়? চট করে হয় না— খুব ধীরে ধীরে হয়। কাজেই এই প্রক্রিয়া বোধ্য যায় না— এক ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখে সে রোবট হয়ে গেছে। তখন সে অত্থকে অস্ত্র হয়ে যায়। তিনি নিজে কি এখন অত্থকে অস্ত্র হয়েছেন? হ্যাঁ হয়েছেন। সাক্ষণ্য তাঁর একা একা লাগে এবং মানুষের সঙ্গে অসহ বোধ হয়। এই অসহ বোধ হওয়া ব্যাধি বাঢ়ছে। জ্বরেই বাঢ়ছে। এর মধ্যে দু'বার তাঁর মনে হয়েছে হেঁচে থাকার তেমন কোনো অর্থ নেই। সাধারণভাবে মনে হয় নি, তীব্রভাবেই মনে হয়েছে।

অভ্যবার মনে হল তিন বছর আগে। রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছেন। রেহানা বলল, ‘আজকের ভেজিটেল কোণা তোমার কেমন লেগেছে?’ তিনি বললেন, ‘ভালো।’

‘একটু টক টক লাগছিল মা?’

‘হঁ।’

‘তেঁচুল বেশি হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজি রান্না তো — সব কিছুতেই তেঁচুলদেয়।’

‘হঁ।’

‘আমি বাবুচিকে বলেছি — তেঁচুল ছাড়া একবার করতে।’

‘ভালো করেছ।’

‘কাল করতে বলব?’

‘বল।’

তিনি কোনবালিশ জড়িয়ে শয়ে পড়লেন। বাতি নিতিয়ে রেহানা ঘুমুতে রেল এবং সে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁর ঘুম আসছিল না। তিনি এপাশ-গোশ করলেন না।

BanglaBook.org

নড়াচড়া করলে রেহানার ঘূম তেঙ্গে যাবে। চৃপচাপ শয়ে রইলেন। বাথরুমের ট্যাপ বোধহয় ভালোমতো বন্ধ করা হয় নি। কিছুক্ষণ পর পর ‘ট্প’ করে পানির ফৌটা পড়ার শব্দ আসতে লাগল। এক মিনিট বীরবতা— তারপর ‘ট্প’ করে একটা শব্দ। আবার বীরবতা আবার ‘শব্দ’। তিনি সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বাথরুমের ট্যাপ ভালো করে বন্ধ করলেন। তখন ঘড়ির শব্দ শোনা যেতে লাগল। টক টক করে সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে। তিনি আবার উঠলেন। দেয়াল থেকে চেয়ারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি নামানোর কোনো অর্থ হয় না। তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনের রাস্তা ফাঁকা। কোনো লোক চলাচল নেই। শীতের রাতে এই সময় লোক চলাচল থাকেও না। সে রাতে শীত খুব তীব্র ছিল। কিন্তু তাঁর শীত লাগছিল না। তাঁর গায়ে ঝ্লানেরে লিপিং সৃষ্টি। বারান্দায় খোলা বাতাস দিছে। শীতে তাঁর জমে যাওয়ার কথা। তিনি রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। তার একটু গরম লাগতে লাগল। সেই সঙ্গে ক্ষীণ ইচ্ছা হতে লাগল লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যেতে। তাঁর মনে হল পড়াটা খুব ইন্টারেষ্টিং হবে। তিনতলা থেকে নিচে পড়ার সময় মাথাটা যদি আগে পড়ে তাহলে মাথা থ্যাক্সানোর টাস করে একটা শব্দ হবে। সেই শব্দটাও ইন্টারেষ্টিং হবার কথা। এই জাতীয় চিন্তা সব মানুষের ভেতর কখনো না কখনো আসে, কিন্তু চিন্তাটা স্থায়ী হয় না। মুহূর্তের মধ্যে আসে আবার মুহূর্তের মধ্যে চলে যায়। তাঁর গেম না। তিনি ছির সিন্ধানে এলেন যে লাফিয়ে নিচে পড়বেন। পড়ার জন্যে ভালো জ্ঞানগা বের করতে হবে। নরম কোনো জ্ঞানগায় পড়লে হবে না। শান্তিকানো জ্ঞানগায় পড়তে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবেন এই চিন্তাটা তাঁর এত ভালো লাগতে লাগল যে আনন্দে গায়ে কঁটা দিল। তাঁর মনে হল— অনেক অনেক দিন তিনি এই আনন্দ পান নি। তিনি রেলিংবের ট্প’র উচ্চতে যাচ্ছেন তখন শোবার ঘরের দরজা থেকে রেহানা বলল, ‘এই ভূমি একা একা এখানে কী করছ?’

তিনি স্তীর দিকে তাকালেন। এত বিরক্তি এবং এত রাগ নিয়ে তিনি তাঁর স্তীর দিকে এর আগে তাকান নি।

‘পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে আছ তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? আমি তো শীতে মরে যাচ্ছি। ঘূম আসছে না?’

‘না।’

‘ঘূমের ওষুধ থাবে? না খাওয়াই ভালো— একবার খেলে অভ্যাস হয়ে যান^(১)আমাকে দেখ না। তিনটা সিডাকসিন না খেলে তন্মু পর্যন্ত আসে না। এস ভেতরে এস^(২) ইস্রে কী ঠাণ্ডা!

তিনি ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় ঘূমুতে গেলেন এবং বিছানায় শোয়ামাত্র ঘূমিয়ে পড়লেন। তিনি বোকা নল, তিনি বুদ্ধিমান মানুষ, যা ঘটেছে তা যে আবারো ঘটবে তা তিনি জানেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতে চান সেই পথ স্কেক্স খুজতে হবে। এখানে সাহায্য করার আসলে কেউ নেই।

বিলেতে তিনি এক নামি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে শিয়েছিলেন। এক এক সিটিটে এই ড্রগেক পঁচাত্তর পাউন্ড করে নেন। রঙচঙ্গে পোশাক পরা এক বুড়ো, যে ফুর্তিবাজের

ভূমিকায় অভিনন্দন করার চেষ্টা করছে। অভিনন্দন তালো হচ্ছে না। মোবারক সাহেব চট করে সেই অভিনন্দন ধরে ফেললেন এবং বুড়োর জন্যে তাঁর একটু মায়াও লাগল।

বুড়ো বলল, ‘তোমার সমস্যা কি?’

মোবারক সাহেব বললেন, ‘আমার কোনো সমস্যা নেই।’

‘আমার কাছে এসেছে কেন?’

‘গুরু করতে এসেছি।’

‘বোস। বোস। আরাম করে বোস এবং গুরু কর। গুরু ভূমি করবে, না আমি করব।’

মোবারক সাহেব বললেন, ‘দু’জনে যিলেই করব।’

‘প্রথমে ভূমি শুরু কর— দেবি তোমার গাঁট ইন্টারেক্ষন কিনা। ভূমি নিশ্চিত তোমার কোনো সমস্যা নেই?’

‘আমি নিশ্চিত।’

‘তাইলে তো ভূমি মানুষ নই, ভূমি কানিচার পোলীয়— টেবিল বা চেয়ার। মানুষ হলে সমস্যা থাকতেই হবে।’

‘তোমাদের বিদ্যা তাই বলে?’

‘হ্যা, তাই বলে। একবুরুশ সমস্যা থাকবে— তোমরা আমাদের কাছে আসবে। আমরা খেয়ে পাবে বাচ্চা, তোমরাও পাউডে ফ্যাক্টের একটা জারুরী পাবে— হা-হা-হ্যা।’

মোবারক সাহেব শক্ত করলেন, বুড়ো নকল হাসি হাসছে। এদের কাছে আসা অর্থহীন। তারপরেও কিছু কথাবার্তা হল। তিনি এক সময় জানতে চাইলেন— ‘মানুষ মরতে চায় কেন?’

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, ‘অসংখ্য কারণে মানুষ মরতে চায়, ভূমি কি জন্যে চাই সেটা ভূমি জান।’

মোবারক সাহেব বুড়োর বুদ্ধির অশুল্য মনে মনে করলেন। একটা সিটিজে যে পঁচাত্তর পাউডে নেয় তার কিছু বুদ্ধি তো থাকতেই হবে। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করে মোবারক সাহেবের কোনো শাত হয় নি। তাঁর সমস্যা তিনি জানেন। তিনি বিশিষ্ট হবার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁকে বেঁচে থাকতে হলে বিশিষ্ট হবার ক্ষমতা কিনে পেতে হবে। কিন্তু এমন কাউকে পাশে নাপে যাব বিশিষ্ট হবার ক্ষমতা প্রযুক্ত।

বইয়ের দোকান থেকে তিনি বাপ্পের উপর দুটা বই কিনলেন। সেসব গার্ল মালিশুধে বলল, ‘ভূমি বুবি শুব শুন্মু দেখে?’

মেয়েটার কথা তাঁর তালো লাগল। এই মেয়েটি বোবাট হয়ে যায় ভূমি। তাঁর বিশিষ্ট হবার ক্ষমতা আছে। দু’টি বাপ্পের বই কিনতে দেখে সে বিশিষ্ট হয়েছে।

‘ভূমি কি আর কোনো বই নেবে?’

‘সুইনাইজের উপর কোনো বই আছে?’

‘হ্যা আছে। Anatomy of Suicide.’

শীঘ্ৰ শূন্তার বিয়াট একটা বই। তিনি ডলার দিচ্ছেন। মেয়েটা কোতৃহলী হয়ে তাকে দেখছে।



ରେଶମା କ୍ୟାନ୍ଟିନେ ଚା ସେତେ ଚୁକେଛେ । ଏଫଡିସିର କ୍ୟାନ୍ଟିନେ ଏହି ସମୟ ଜାଯଗା ପାଓଯା ମୁଶକିଲ— ଆଜି ଫାଁକା । ଶୁଦ୍ଧ ସେ କ୍ୟାନ୍ଟିନ ଫାଁକା ତାଇ ନା— ପୁରୋ ଏଫଡିସିଇ ଫାଁକା । ସବାର ଶ୍ୟାଟିଂ ପାକାନ୍ତାପ ହୁୟେ ଗେଛେ— ଫାଇଟାର ଗ୍ରିପେର ଏକଟା ହେଲେ ମାରା ଗେଛେ । ଶ୍ୟାଟିଂ ଏହି କାରଣେ ବନ୍ଦ । କ୍ୟାନ୍ଟିନେର ମ୍ୟାନେଜାର ବିରସ ମୁଖେ ବନ୍ଦେ ଆହେ । ଏକ କୋନାର ଦିଲଦାର ଥିବୁକା ଏକଜନ ଏଙ୍ଗଟାର ସଙ୍ଗେ ଜମିଯେ ଆଡ଼ା ଦିଛେ— ନାଲି ନାଲି କରେ ଡାକଛେ । ନାନିର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦମଳେ ପୋଶାକ ପରା ଏକ କିଶୋରୀ । ଚୋର ବଡ଼ ବଡ଼ କରେ ସେ ଗର୍ବ କୁଳହେ । ଦିଲଦାରେର ଦୃଷ୍ଟି କିଶୋରୀର ଦିକେ । ରେଶମାକେ ଦେଖେ ଦିଲଦାର ଥି ଆନନ୍ଦିତ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ଏହି ସେ ମ୍ୟାଡାମକେ ପାଓୟା ଗେଛେ । ଜାଦ ଆସ ।’ କିଶୋରୀ ମେଯୋଚି ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ଵାସେ ତାକେ ଦେଖିଛେ । ସତି ସତି ରେଶମାକେ ବୋଧହୁ ନାଯିକା ଭେବେଛେ । ରେଶମା ଏଗିଯେ ଗେଲ । ଦିଲଦାର ଥି ଦରାଜ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ମ୍ୟାଡାମକେ ଚା ଦାଓ । ସିହାଢ଼ା ଦାଓ । ତାରପର ମ୍ୟାଡାମ ଥବର କି?’

‘କୋନୋ ଥବର ନାହିଁ ।’

‘ଶ୍ୟାଟିଂ ନାକି ଆବାର ଶୁଭ ହୁୟେଛେ । ଥବର ନାହିଁ ବନ୍ଦ କେନ୍ତା? ଏଇଟାଇ ତୋ ବଡ଼ ଥବର ।’

ଦିଲଦାର ବାନ୍ତ ହୁୟେ ମାନିବ୍ୟାଗ ବେର କରଲ । ରଞ୍ଚଟଙ୍କେ ଏକଟା କାର୍ଡ ବେର କରେ ବଲଲ, ‘ନାଓ ଥନ୍ତ୍ର କରେ ରାଖ ।’

‘ଏଟା କୀ?’

‘ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ । ଛପିଯେ ଫେଲାଯ— ଅୟାଦ୍ରେସ ଟୋଲିଫୋନ ନାମାର ସବ ଶେଷା ଆହେ ।’

‘ତାଲୋ କରେଛେ ।’

‘ତାଲୋ—ମନ୍ଦ ଜାନି ନା, ସେ ବ୍ୟବସାର ଯେ ଚାଲ ।’ ଏଥନକାର ଚାଲ ହୁୟେ— ଦୁଃଖ କଥା ବଲାର ପରଇ ହାତେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ତୁଙ୍ଗେ ଦେଇଯା । କିଛିଦିଲିନ ପର ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ହବେ କିମ୍ବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବେ ନା । ଦୁଃଖ ଦୁଃଖନେର ହାତେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ଦିଯେ ମୁହଁର ପଥେ ଚଲେ ଯାବେ— ହା-ହା-ହା ।’

ବୁନ୍ଦାର ଚା ଖାଓୟା ଶେଷ ହୁୟେ ଗେଛେ । ସେ ବଲଲ, ‘ଦିଲକର ତାଇ ଉଠିଛି?’

ଦିଲଦାର ବଲଲ, ‘ଆରେ ନା ଏଖନିଇ କି ଉଠିବେ? କିଥାଇ ତୋ ହ୍ୟ ନି । ଏହି ମେଯେ କେ? ତୋମାର ନାତନି?’

‘ହଁ ।’

‘চেহারা ছবি তো ভালো— অভিনয় করবে? নাম কি?’

‘জমিলা।’

‘আগ্রহ থাকলে কোনো এক জায়গায় চুকিয়ে দেব— অসুবিধা নাই। মেয়ের অবশ্য টেট মোটা, সেটা কোনো বাপার না। কৃপালে থাকলে নায়িকা হওয়া কিছু না।’

রেশমা লক্ষ করল জমিলার চোখ চকচক করছে। রেশমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দিলদার রেশমার দিকে দুঁকে এসে বলল, ‘তোমাদের ছবির সমস্যা মিটাট কীভাবে হল?’

‘জানি না।’

‘সবাই জানে, তুমি কিছু জান না এটা কেমন কথা। সত্ত্ব জান না?’

‘না।’

‘তাহলে শোন আমার কাছে। সে এক ইতিহাস...’

ইতিহাস শোনা হল না। রেশমাদের একজন প্রজ্ঞান প্রত্নকৌশল বয় ক্যান্ডিনে চুকেছে। সে রেশমাকে দেখে রাগী গলায় বলল, ‘জ্ঞান কোমারে খুঁজে।’

রেশমা চা বেথেই উঠতে যাচ্ছিল। দিলদার বলল, ‘চা শেষ করে তারপর যাও। যত বড় জ্ঞানটুকু হোক— যাওয়া ফেলে ছুটে যেতে হবে না। তাহাত্তা শ্যাটিং তো আজ হচ্ছে না। পুরো এফডিসি প্যাকআপ।’

চা আগুনগরম। দ্রুত যাওয়া যাচ্ছে না। দিলদার বলল, ‘ম্যাজার আল্টে আল্টে খান। জিভ পুড়ে কষণা হয়ে যাবে। হাঁ করলে দেখা যাবে কুচকুচে কালো জিভ।’

জমিলা মেয়েটি এই বাসিকতায় ঝুঁক হাসছে। মেয়েটা সুন্দর। সত্ত্বিকার ঝপবতী মেয়েদের লক্ষণ হল হাসলেও এদের সুন্দর দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্লাপবতী মেয়ে হাসলে কুৎসিত হয়ে যায়। এই মেয়েটা হচ্ছে না। সে যতই হাসছে ততই সুন্দর হচ্ছে।

রেশমা চায়ের টাকা দিতে গেল। দিলদার হংকার দিয়ে উঠল, ‘খববদার ম্যাজার! তুমি দিলদারের গেষ। তিভিটিং কার্ডটা যত্ন করে রেখে দিও— কখন দয়কার হয় কে জানে। রাত ম'টাৰ পর টেলিফোন করলে পাবে। অনেক সময় টেলিফোন লাইন নষ্ট থাকে— তখন সরাসরি চঙ্গ আসবে অ্যান্ড্রোইড লেখা আছে।’

ন'ন্দুর শ্যাটিং ফ্লোরে লোকজন নেই। এক ঘট্টা আগে প্যাকআপ হয়েছে। এতক্ষণ শোক থাকার কথা না। শ্যাট সরানো হয় নি। সেকেত শিফটে কাজ হবে— কাজেই যেটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আঙ্গুষ্ঠ তরফদার এখন বাড়ি যাবেন্নেজিপি শট ডিপিশনের কিছু কাজ বাবি আছে। কাজ শেষ করবেন। ট্রলি শট মেকটিংটা ছিল সব বদলাতে হচ্ছে। ফ্লোর উচুনিচু হয়েছে। ট্রলি শুধুলি মূড় করছে না। ক্ষমত্বের কাঁপছে।

আঙ্গুষ্ঠ তরফদার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে আছেন। জ্ঞান যাবা ধরেছে। একজন ফ্লোর-বয় তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছে। তাঁর ঠিক দু'হাত পেছনে ফ্লোর ফ্যান বসানো হয়েছে। ফ্যান হেকে বাতাস ঘূর্ণ না হচ্ছে শব্দ হচ্ছে তারচেয়ের শব্দ।

রেশমা আঙ্গুষ্ঠ তরফদারের সামনে দাঁড়াল। ডয়ে ডয়ে বলল, ‘আঙ্গুষ্ঠ ভাই আমাকে খবর দিয়েছেন?’ আঙ্গুষ্ঠ তরফদার চোখ মেলেন, চোখ টকটকে দাল। এটা কোনো অসুব না বা রাত্রি জাগরণের ফল না। সব সময় তাঁর চোখ এ বুকম। প্রথম বার

দেখলে মনে হয়— কিছুক্ষণ আগেই আলতা দিয়ে চোখ ধোয়া হয়েছে।

আজমল তরফদার চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন। যে ফ্লোর-বয় মাথা বিলি দিয়ে দিচ্ছিল তাকে বললেন, ‘ঠাণ্ডা এক শাস লেবুর শরবত আমার জন্যে আন। চিনির শরবত না— নববর্ষের শরবত।’

রেশমা দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় লাগে। তবে মানুষটা ভালো। মেঘেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিয়ে কোনো বদনায় এই মানুষটার নেই।

‘রেশমা তোমার নাম?’

‘জ্ঞি।’

‘দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।’

বসার জন্যে চেয়ার বা টুল কিছুই নেই। বসতে হলে মেঘেতে বসতে হয়। রেশমা মেঘেতে বসে পড়বে কিনা বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার হংকার দিলেন— ‘এই কেউ নেই, এখনে চেয়ার দিয়ে যা।’

ফ্লোর-বয় চেয়ার নিয়ে ছুটে এল। রেশমার অস্তি লাগছে। এজ্যাটা মেঘের জন্যে কোনো পরিচালক হংকার দিয়ে চেয়ার আনায় না। রহস্যটা কী?

‘বোস। চা খাবে?’

‘জ্ঞি না।’

‘তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খাও।’

‘জ্ঞি না।’

‘বার বার না বলবে না। বার বার না শুনতে ভালো লাগে না। ফ্লোরে কে আছে, ঠাণ্ডা কোক আন।’

প্লাস্টিক কোক হাতে রেশমা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। তার মাথা ফুরছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বক্ষ করেছেন। ফ্লোর-বয় তার মাথার চুল টেনে দিচ্ছে।

‘রেশমা।’

‘জ্ঞি।’

‘তুমি মোবারক সাহেবকে চেন?’

‘জ্ঞি না।’

আজমল তরফদার চোখ মেললেন। টকটকে লাল চোখ দেখলেই ভয় লাগে। তিনি ভুক্ত কুঁচকে বললেন, ‘মোবারক সাহেবকে চেন না?’

‘জ্ঞি না।’

‘জাহাজের ব্যবসা করেন যিনি সেই মোবারক। টেক্সেটিল মিল আছে— মোবারক টেক্সটাইলস— কোটিপতির উপরে যদি কিছু থাকে সেই পাতি।’

‘জ্ঞি না আমি চিনি না।’

‘কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি?’

‘জ্ঞি না।’

‘ও আছা। ঠিক আছে এইটা জানাব জন্যে।’

‘আমি চলে যাব আজমল তাই?’

‘আচ্ছা যাও। শোন শোন তোমার পেমেন্ট হয়েছে?’

‘জ্ঞি না, যিজান ভাই বলেছেন কোনো কাজ হয় মাই সেজন্স পেমেন্ট হবে না।’

‘তোমার পেমেন্ট হবে। অফিস থেকে পেমেন্ট নিয়ে যাও—আমি ম্যানেজারকে টেলিফোন করে দেব। আচ্ছা এখনি করছি।’ আজমল তরফদার কর্তৃর কোটের পাকেট থেকে সেন্টুলার টেলিফোন বের করলেন। রেশমার বিশয়ের সীমা রইল না। ব্যাপারটা কি।

আজ ম্যানেজার মূলশি রেশমাকে দেখান্ত ভাউচার বই দেবে করল। রেশমা সই করতে পিয়ে দেখে পাঁচ শ টাকা দেখা। তার পেমেন্ট দিন হিসেবে। এক দিনে তার আপ্য হয় আড়াই শ। দেয়া হচ্ছে পাঁচ শ।

মূলশি টাকা বের করতে করতে বলল, ‘চা খাবেন?’

এও এক বিশ্বাসীয় ব্যাপার। বাধী কথাচিত্রের ম্যানেজার মূলশি তাকে আপনি করে বলছে।

‘চা খাব না। আমার কাজ আছে। যাই?’

‘জ্ঞি আছা।’

তার কোনো কাজ নেই। শ্যাটিং প্যাকআপ হওয়ায় সারাটা দিন তার হাতে। সেকেন্ড শিফটে কাজ হবে। সেকেন্ড শিফট কাগজে—কলমে বিকেল ঢারটা থেকে শুরু হলেও ফোর ম্যানেজার বলে দিয়েছে কাজ শুরু হবে যাগরেবের নামায়ের পর। এই দীর্ঘ সময় এফডিসিতে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। মবিন ভাইয়ের মেসে হট করে চলে যাবে নাকি? অনেকদিন যাওয়া হয় না। এই সময় তাকে মেসেই পাওয়ার কথা। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা আর রাত এই সময়গুলোতে মবিন ভাই ব্যস্ত থাকেন—প্রাইভেট পড়ান। বিকেন্ডের আগ পর্যন্ত সময়টা অবসর।

মবিন ভাইয়ের জন্যে একজোড়া স্যান্ডেলও কেনা দরকার। তার স্যান্ডেলের যে অবস্থা। বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া গেছে যখন ...।

স্যান্ডেল কেনার ব্যাপারটায় সে মনস্তির করতে পারছে না। তার টাকা—পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে। চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল। ঐ দিনের দু' হাজার টাঙ্কি বাড়ি ভাড়ায় চলে গেছে। তারপরেও খালি হাতে মবিন ভাইয়ের কাছে যাওয়া যাবে না।

কমদামি স্যান্ডেলও ছিল, সে বোঁকের মাথায় তিন শ পঁচিশ টাঙ্কি দিয়ে একজোড়া স্যান্ডেল কিনে ফেলল। মাপে হবে। এর আগের স্যান্ডেল জোড়াও তার কিনে দেয়া, সে মাপ জানে।

বাস প্রায় ফাঁকা। সে জানালার পাশে বসেছে। বাস প্রস্তুত চলেছে। তার কেন্দ্র যেন শান্তি শান্তি লাগছে। অর্থচ শান্তি লাগার কিছু নেই। সে বুরতে পারছে তার সামনে অনেক অশান্তি— যোবারক সাহেব হঠাৎ উদয় হয়েছেন কেন? সে ধরেই নিয়েছে তার জীবনের কিছু আলাদা অংশ আছে। মূল জীবনের সঙ্গে সেই জীবনের কোনো মিল নেই। মূল

জীবনের সঙ্গে তা যুক্তও নয়। ওই জীবন তার নয়— অন্য একটা মেয়ের জীবন, যার নাম টেপী। সে টেপী নয়— সে রেশমাও নয়; সে মিতু। মোবারক নামের লোকটিকে টেপী হ্যাতো চেনে, সে চেনে না।

জয়দেবপুর চৌরাষ্ট্র রেশমা বাস থেকে নামল। নেমেই সে মিতু হয়ে গেল। এক প্যাকেট ভালো সিগারেট কিনতে হবে। মানুষটির ভালো সিগারেটের এত শখ— টাকার অভাবে খেতে পারে না। পৃথিবীটা যদি এ রকম হত— দোকান ভর্তি জিনিস থেরে থেরে সাজানো। যার যা প্রয়োজন উঠিয়ে নিয়ে যাবে কাউকে কোনো টাকা দিতে হবে না। সিগারেট কেনার পর মিতুর মনে হল— একটা কী যেন বাকি আছে। এর আগের বার মবিন ভাইয়ের কাছে যখন এসেছিল ভখন চিক করে রেখেছিল পরের বার আসার সময় অবশ্যই কিনে আনবে। এখন মনে পড়ছে না।

দরজির দোকানের উপরে একটা ঘর নিয়ে মবিন থাকে। এক শ টাকা ভাড়া। ঘরে প্লাষ্টার হয় নি— জানালা লাগানো হয় নি। জানালার খোলা অংশ করোগেটে লিন দিয়ে বন্ধ। মবিনের ঘরে ওঠার সিঁড়ি অসুস্থ সফল। রেগিং নেই। সাবধানে উঠতে হয়। বর্ষাকাল বলে সিঁড়ি ভিজে স্যাতস্যাতে হয়ে আছে। মিতু খুব সাবধানে উঠছে। তার হঠাত মনে হল— এখন যদি দেবে মবিন ভাই নেই তখন কেমন লাগবে?

মবিন ঘরেই ছিল। সে দরজা খুলে অবাক ঢোকে তাকিয়ে রইল। মিতু বলল, ‘দরজা ছাড়। দরজা ধরে থাকলে ভেতরে ঢুকব কীভাবে?’

মবিন বলল, ‘হাত ধরে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই?’

‘সেটা আবার কী?’

‘খুব সশ্রান্তি যারা তাদের হাত ধরে ঘরে ঢোকাতে হয়।’

‘আমি কি খুব সশ্রান্তি?’

‘অবশ্যই।’

‘তাহলে হাত ধরে নিয়ে যাও।’

মবিন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। হাত ধরল না। ধরবে না মিতু জানত। অশোভন কিছু কখনোই সে করবে না। মবিন বলল, ‘পা তুলে আরাম করে বিছানায় বোস। তুমি কি দুপুরে থেয়ে এসেছ?’

‘না।’

‘তাহলে দুপুরে আমার সঙ্গে থাবে।’

‘হেটেলের কুণ্ডিত খাবার। রবারের গোশত আর টকে যাইয়া ডাল।’

মবিন হাসিমুরে বলল, ‘ভালো খাবার। চিফিন কেরিয়াল করে আসবে।’

‘কোথেকে আসবে?’

‘এক কন্ট্রুক্টর সাহেবের বাসা থেকে। উনার বড় মেয়ে এসএসসি দেবে। তাকে এখন ইংরেজি শিখাচ্ছি— বিনিয়ন্ত্রে মাসে সাত শ টাকা পাছি প্রাস দু’বেলা খাবার। রাতের খাবার ঐ বাসাতেই থাই— দুপুরেরটা তারা টিকিন কেরিয়াল করে পাঠিয়ে দেয়।’

‘তোমাকে এতে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ আনন্দিত। মহিলার রান্না অসম্ভব ভালো। যা রাঁধে তাই অমৃতের মতো লাগে। ঐদিন আলুভর্তা বানিয়ে পাঠিয়েছে। আলুভর্তার সঙ্গে সর্বে বেটে দিয়েছে— আর দিয়েছে ধনেপাতা। এতগুলো ভাত খেয়ে ফেলেছি শুধু আলুভর্তা দিয়ে। আচ্ছা তুমি এ রকম শক্ত হয়ে বসেছ কেন? আরাম করে বোস না।’

‘আরাম করেই তো বসেছি।’

‘আরো আরাম করে বোস। দেয়ালে হেলান দিয়ে বোস।’

মিতু দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। মবিন বলল, ‘তোমার খবর কি বল?’

মিতু হাসিমুখে বলল, ‘বলার মতো কোনো খবর নেই। তোমার খবর কি?’

‘আমার দুটা খবর আছে — একটা ভালো, একটা খারাপ। কোনটা আগে শুনতে চাও?’

‘ভালোটাই আগে শুনি।’

‘আমার ঘরের জ্ঞানলা লাগানো হচ্ছে, এখন বিজ্ঞান শুয়ে শুয়ে আমি আকাশ দেখতে পারব।’

‘খারাপ খবরটা কী?’

‘খারাপ খবর হল — জ্ঞানলা ফিট করায় ঘরের ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। কত বাড়ছে বলতে পারছি না, তবে বাড়ছে ...’

মবিন হাসছে। মিতু মুক্ষ চোখে তাকিয়ে আছে। এ ভাবে দীর্ঘ সময় কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই — এতে যার দিকে তাকিয়ে থাকা হয় তার অঙ্গুল হয়। নজর লেগে যায়। মিতু চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘আমি তোমার জন্যে উপহার এনেছি। বল তো কী?’

‘চিরুনি।’

‘কী করে বুঝলো?’

‘শেষবার যখন এসেছিলে তখন আমার চিরুনি দেখে বলে গেছ আমাকে একটা চিরুনি উপহার দেবে। এই আশায় আমি চিরুনি কিনি নি। আঙুল দিয়ে চূল আঁচড়াই।’

‘সত্যি আঙুল দিয়ে চূল আঁচড়াও?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি কিন্তু চিরুনি আনি নি। ভুলে পেছি। আমার মনে হচ্ছিল কী একটা জিনিস যেন ভুলে পেছি। তোমার জন্য একজোড়া স্যান্ডেল এনেছি।’

‘সিগারেট? সিগারেট আন নি?’

‘হ্যাঁ।’

‘দেখি দাও।’

মিতু সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল। মবিন প্যাকেট হাতে নিতে নিতে বলল, ‘আমাদের বিয়ের পরেও কি তুমি আমাকে উপহার দেবে?’

‘আমি যতদিন বেঁচে থাকব, দেব।’

‘কীসের শপথ?’

‘সূর্য এবং চন্দ্রের শপথ।’

‘সূর্য এবং চন্দ্রের নামে তো মানুষ চিরকাল শপথ নিছে — তুমি নতুন কিছুর নামে নাও।’

‘কার নামে শপথ নিতে হবে তুমি বলে দাও।’

‘শপথ হওয়া উচিত তোমার সবচে’ প্রিয় প্রিন্সের নামে। তোমার সবচে’ প্রিয় কী?’

‘তুমিই আমার সবচে’ প্রিয়।’

‘তালো করে ভেবেচিষ্টে বল।’

‘আমি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ভেবেছি। কাজেই আমি এখন শপথ করছি মবিনুর রহযানের নামে — আমি যত দিন বেঁচে থাকব ...

‘শপথ বাক্য শেষ করার আগেই দরজা ঢেঙে টিফিন কেরিয়ার হাতে ন’ দশ বছর বয়সী একটা ছেলে চুকল। মবিন ছেলেমানুরের ঘরতো চেঁচিয়ে উঠল — খাওয়া চলে এসেছে, খাওয়া। ছেলেটা বিশিষ্ট চোখে তাকাচ্ছে। মবিন বলল, — ‘এই ছেলের নাম বুড়ো। নাম সুন্দর না?’

মিতু কিছু বলল না। মবিন কথা বলার জন্যেই কথা বলছে। আনন্দিত মানুষ অকারণে কথা বলে। অকারণে অজস্র প্রশ্ন করে। সেই সব প্রশ্নের জবাব তারা আশা করে না। মিতুর খারাপ লাগছে সে শপথের অংশটা শেষ করতে পারে নি। শপথটা শেষ করতে পারলে তার নিজের তালো লাগত। বুড়ো নামের ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে কেমন অভিভাবক অভিভাবক চোখে তাকাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে বাসায় গিয়ে বালিয়ে বালিয়ে অনেক কিছু বলবে। মিতু বলল, ‘তোমার বুড়ো কি এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে?’

মবিন বলল, ‘হ্যাঁ। খাওয়া শেষ হলে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে যাবে।’

‘ওকে চলে যেতে বল, ওর সামনে বসে আমি খাব না।’

‘বুড়ো তুমি চলে যাও — আমি সন্ধ্যাবেলা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাব।’

‘আইজ আফনেরে যাইতে নিষেধ করছে। আইজ আফর শহীদ খারাপ।’

‘আচ্ছা যাব না। তুমি পরে এসে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাবে।’

ছেলেটা নিতান্ত অনিছায় চলে যাচ্ছে। মিতু বলল, ‘রাতে তোমাকে যেতে নিষেধ করল, রাতে তুমি খাবে কোথায়?’

‘ওরা খাবার পাঠিয়ে দেবে।’

মিতু দেখল মবিন খুব আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ বিছাচ্ছে, টিকিট কেরিয়ারের বাটি সাজাচ্ছে। ঘরে একটাই প্রেট। সেটা মিতুকে দেয়া হল। মবিন বাটিতে খাবে। আয়োজন অনেক — বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, বাল ঝাল করে রান্না কর্মসূর্য গোশত, দু’ রকমের ডাল। মবিন খুশি খুশি গলায় বলল, ‘গ্রেডের ডাল রান্না কর্মসূর্য হয়। তোমাকে একদিন ঐ মহিলার কাছে নিয়ে যাব। ডাল রান্না শিখে আসবে। প্রিসিপি কাগজে—কলমে শিখে আনলে কিছু হয় না, এসব শিখতে হয় হাতে—কলমে। যাবে একদিন আমার সাথে?’

‘যাব।’

‘ডালটা একটু চেখে দেখ— অসাধারণ কিনা বল।’

‘ইঁ অসাধারণ।’

‘ডাল রান্নার উপর এই মহিলাকে অনায়াসেই একটা পি.এইচডি ডিপ্রি দিয়ে দেয়া যায়।’

‘এই টিউশ্যানিটা পেয়ে তুমি মনে হয় সুবেহে আছ।’

‘খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়ে আবায়ে আছি— তবে ছাত্রী পড়িয়ে কোনো আরাম পাই না।

‘কেন?’

‘যতক্ষণ পড়াই ততক্ষণ ছাত্রীর মা কাছেই একটা চেয়ারে কঠিন কঠিন চোখ করে বসে থাকেন। মেয়েকে পাহারা দেন। যেদিন তিনি থাকেন না সেদিন অন্য কেউ থাকে। নিজেকে খুব ছেট লাগে।’

মিতু হালকা গলায় বলল, ‘তারা জানে না তোমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো। জানসে মেয়ের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করত না।’

‘আমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো! কী যে তুমি বল! সাধু-সন্ন্যাসীদের বেশিরভাগই চরিত্রহীন। তুমি হিন্দু ধর্মস্থগ্নে পড় নি, পড়লে বুঝতে ওদের খবরিয়া কী টীজ— হা-হা-হা।’

‘খাওয়ার সময় এ রকম শব্দ করে হাসবে না। বিষম জাগবে।’

‘তাতে কি কয় পড়বে?’

‘না কয় পড়বে না।’

‘দেখেছ এরা কেমন চাল খায়? এ চালের নাম হচ্ছে কাটারিভোগ। বিশ্বের পর আমরা যখন সংসার পাতব তখন এই কাটারিভোগ চালই খাব। দু’জন মানুষ, চাল তো বেশি জাগবে না, কী বল?’

মিতু জবাব দিল না। মরিন বলল, ‘মাসে পনের কেজি চালের বেশি তো আমাদের লাগবে না। কাটারিভোগের কেজি কৃত করে তুমি জান?’

‘জানি না। আচ্ছা খাওয়াওয়া ছাড়া অন্য কোনো গুরু করলে কেমন হয়?’

‘খুব ভালো হয়।’

‘বেশ তাহলে অন্য গুরু বল।’

‘অন্য গুরু তুমি বল — অধি শুনি।’

‘আমার তো সব ছবির লাইনের গুরু। এসব গুরু জনতে তোমার ভাস্কুল জাগবে না।’

‘খুব ভালো জাগবে। তুমি যা বল তাই জনতে ভালো লাগে। কৃত্য কী জান?’

‘না।’

‘তোমার গলার স্বর অদ্ভুত সুন্দর। মনে হয় বাজনা করছে।’

‘কী বাজনা — ঢোল?’

‘জন্মতরঙ্গ।’

‘সেটো আবার কী বাজনা?’

‘চিনামাটির বাটিতে পানি ভর্তি করে কাঠি দিয়ে বাজায়। অনেকগুলো বাটি মেয়া
হয়। বাটিতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে শব্দের ঝিকোয়েপি ঠিক করা হয়। মন্ত্র
সন্তুষ্ট থেকে...’

‘উফ! বক বক বন্ধ কর তো।’

মবিন হেসে ফেলে। মিতু বলল, ‘তোমার একটাই সমস্যা — কোনো কথা শুন
করলে স্টোকে জ্ঞানের কথায় নিয়ে ফেলবে। জ্ঞানের কথা কি আমার মতো সাধারণ
মানুষের ভালো লাগে? হাত কোথায় ধোব? তোমার বাথরুম কোথায়?’

‘বাথরুম নিচে — অনেক দূরে। তুমি বাটির মধ্যে হাত ধোও। পান খাবে? মিষ্টি
পান, নিয়ে আসিস?’

‘কিছু আনতে হবে না। তুমি চুপ করে বোস আব ক্রমাগত কথা বলে যাও।’

‘জ্ঞানের কথা?’

‘না, মজার মজার কথা।’

‘আমার কোন কথাগুলো তোমার মজা লাগে তাও তো জানি না। বরং তুমি তোমার
বিদ্যাত জলতরঙ কঢ়ে গঢ়ে বল আমি শুনি।’

‘ফিল্ম লাইনের গুরু?’

‘ফিল্ম লাইনের গুরুই তো সবচেয়ে ইন্টারেক্টিভ হওয়ার কথা।’

‘ফিল্ম লাইনের ভয়ংকর সব গুরু আছে শুনলে তোমার মনটান খারাপ হয়ে যাবে—
যেমন ধর, একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, টেপী তার নাম। আমার মতোই
ছোটখাটো পাঠ করে। তারা তিনি বোন ...’

‘ফিল্ম লাইনের মেয়ের নাম টেপী, অভ্যুত তো। এই লাইনে নামের খুব বাহার থাকার
কথা— নীলাঞ্জলা চৌধুরী টাইপ।’

‘ও তো নায়িকা না যে নামের বাহার থাকবে। ও হচ্ছে অতি নগণ্য এক্সট্রা মেয়ে।
পোষ্টারে এদের নাম যায় না, পর্দায় টাইটেলেও নাম যায় না। কাজেই এদের নাম টেপী
হোক বা নীলাঞ্জলা চৌধুরী হোক কিছুই যায় আসে না।’

‘তারপর বল।’

‘কী বলব?’

‘টেপী সম্পর্কে কী বলতে চাচ্ছিলে বল...’

‘ও আছা — তুরা তিনি বোন — হ্যাপী, টেপী, পেগী। টেপী মেজ ফিল্মে কাজ করে
সে তার সংসার চালায়, মাঝে মাঝে তাকে অন্য কিছুও করতে হয়। ফিল্ম কিছুটা কী তুমি
বুঝতে পারছো?’

‘মনে হয় পারছি।’

‘যাক, তোমার বুদ্ধি তাহলে আমার চেয়ে বেশি। আমাকে প্রথম যখন টেপী বলল,
মাঝে মাঝে আমি অন্য কিছু করি— তখন আমি বুবালতে পারি নি। আমি জিজেস করলাম,
অন্য কিছু কী করব? সে তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে এমন কান্না শুরু করল।’

‘মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি খুব ভাব?’

‘খুব ভাব না। মোটামুটি ভাব। ফিল্ম দাইনে কারো সঙ্গেই খুব ভাব হয় না। আজ
হট করে তোমার এখানে আসার কারণ কী জান? কারণ হল টেপী।’

‘বুকলাম না — বুবিয়ে বল।’

‘আজ মর্নিং শিফটের অ্যাটিং হঠাতে করে প্যাকআপ হয়ে গেল। টেপী বলল, আপা চল
ক্যান্টিনে চা খাই।’

‘তোমাকে আপা ডাকে? বাসে তোমার ছেট?’

‘সমানই হব তবু কেন জানি আপা ডাকে। যাই হোক ওর সঙ্গে চা খেতে গিয়েছি
সেখানে হঠাতে সে এমন কানুন শুন্ধ করল...।’

‘কেন?’

‘জানি না কেন? আমি জিজ্ঞেস করি নি। আমার এত মন খারাপ হল— তাকলাম
তোমার কাছে এলে হয়তো মন ভালো হবে।’

‘মন ভালো হয়েছে?’

‘প্রথমে হয়েছিল। এখন আবার মন খারাপ লাগছে।’

‘কেন?’

‘মেমেটার কথা মনে পড়ে গেল এই জন্যে। আমি একবার ওকে তোমার কাছে নিয়ে
আসব।’

‘আমার কাছে কেন?’

‘কোনো কারণ নেই, এমনি আনব। তোমার টিফিন কেরিয়ার, বাটি এইসব ধূয়ে
দিছি — পানি কেখায় কল তো? নিচে যেতে হবে?’

‘তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি চুপ করে এখানে বসে থাক।’

‘আমি পা তুলে চুপচাপ বসে থাকব আর তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে থালাবাসন ধূবে—
তাবতেও ঘেন্না লাগছে।’

‘ঘেন্না লাগার কিছু নেই — বিশে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্পাণকর; অর্ধেক তার
করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’

‘থালাবাসন ধোয়া এমন কিছু মহান সৃষ্টি না।’

‘বিশে যা কিছু সাধারণ সৃষ্টি চিরকল্পাণকর; হি-ফোর্থ তার করিয়াছে নারী
ওয়ান-ফোর্থ তার নর।’

মবিন হো-হো করে হাসছে। তার সারা শরীরে আনন্দ ঝলমল করছে। মভুর চোখ
ভিজে উঠছে। কেন ভিজে উঠছে সে নিজেও জানে না। মবিনকে এই ছেঁথের পানি দেখতে
দেয়া যাবে না। তাকে মূখ ঘূরিয়ে বসতে হবে। এই ঘরের কোমরে জানালা নেই, জানালা
থাকলে জানালার পাশে গিয়ে দাঢ়ানো যেত। তেজা চোখ দিয়ে আকাশ দেখতে তালো
লাগে।

Bangla
Digitized by srujanika@gmail.com

অফিসে মোবারক সাহেবের দু'টা খাস কামরা। একটা হলসরের ঘরতো বিশাল। ওয়াল
টু ওয়াল ধ্বনিতে সাদা কার্পেটে মোড়া। এক কোনায় দু'ট খাই ছক্ষুজের মেহগনি
কাঠের কালো একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে মোবারক সাহেবের নিচু গ্রেলি চেয়ার।
দেয়ালে বেশ কিছু পেইনিং। পেইনিংের ফ্রেমগুলোও কালো মেহগনি কাঠের।
ইটারন্যাল ডিজাইনার মেবের সাদা কার্পেটের সঙ্গে কালো ফার্নিচারের একটা করিনেশন
করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন— কম্পোজিশান ইন ট্র্যাক এন্ড হোয়াইট। এই ঘরে
যে চামের কাপে চা দেয়া হয় তার রঁ পর্ফুম কালো। পিরিচচলো সাদা।

এই খাস কামরা মোবারক সাহেব সচরাচর ব্যবহার করেন না— তিনি ব্যবহার
করেন বাড়ির চিলেকোঠার খাস কামরা। তুলনামূলকভাবে ঘরটা ছোট— তবে কোনো
আসবাব নেই বাল ছোট ব্রেক অনেক বড় যদে হয়ে দসান জন্যে ঘরে ছাঁট ছোট কার্পেট
পাতা আছে। ইন্দোর নেক্স মালেমের মেবেকে হস্তে নাম রাখলে বাহু। ঘরে
কোনো টেবিল নেই— শুধু মোবারক সাহেবের সাথে মাঝেয়াড়ি সোকানের ক্ষাণ বাজের
ঘরতো ছোট একটা মার্বেলের টেবিল। বড় বড় কাঠের আনন্দায় পর্দা নেই বলেই ছান্দের
গোলাপ বাগান ঢোবে পড়ে। সেই বাগান দর্শনীয়।

আজমল উরফদার জুতা পায়ে মোবারক সাহেবের এই ঘরে চুকে দারুণ অঞ্চল
হয়ে গেলেন। মোবারক সাহেব হাসিমূখে বললেন, ‘এত অঞ্চল হবার কিছু নেই। জুতা
পায়ে অনেকেই চুকে পড়ে। আমি নিজেও কতবার চুক্কেছি।’

‘মেবেতে ময়লা লেপে গেল।’

‘দাতক না। মেবের ময়লা পরিষ্কার করা যাব। আসুন, বসুন আমার সাথে।
মেবেতে বসে অভ্যাস আছে তো? চেয়ার-টেবিল আসার পর খেকে বাঙালি মেবেতে কসা
ভুলে গেছে।’

আজমল উরফদার এসে কললেন। তিনি বসে আরাম পালছেন। জিসের প্যাকে
আঁটেঁট লাগছে। মোবারক সাহেব বললেন, ‘কী বাবেন কলনুঁ?’

‘এক কাপ চা খেতে পারি।’

‘দুপুরে লাক্ষের আপে চা খেয়ে বিদে নষ্ট করবেন কেন? শ্বেত খান। তেঁতুলের

একটা শরবত আছে— আমার খুব প্রিয়। আপনার পছন্দ হলে রেসিপি দিয়ে দেব।'

'খ্যাক মু স্যার।'

'এখন ছবির বিষয়ে বলুন।'

'কী বলব স্যার?'

'আপনাকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে আমি একটা ছবি বানাতে চাই।'

'জ্ঞি সোকমান সাহেবের আমাকে বলেছেন।'

'সেই প্রসঙ্গে বলুন।'

আজমল তরফদার কী বলবেন তোবে পেলেন না। তাঁর এচডি সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে কিন্তু এই ঘরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় না এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে। তদুলোক শরবতের কথা বলেছেন অথচ কাউকে শরবত দিতে বলেন নি। ভুলে গেছেন বোধহয়। ঠাণ্ডা এক গ্লাস শরবত পেলে তালোই হত।

'ছবির কোন ব্যাপারটা জানতে চান?'

'সবই জানতে চাই।'

'কী পরিমাণ টাকা লাগবে তা দিয়ে স্কুল করিব।'

'করুন।'

'ছবির জগতে আগার লিমিট বলে কিছু নেই। কেউ ইচ্ছা করলে একটা ছবি বানাতে পাঁচ কোটি টাকাও খরচ করতে পারে।'

'আগার লিমিট না থাকলেও লোয়ার লিমিট নিশ্চয়ই আছে।'

'জ্ঞি তা আছে। জিনিসপত্রের দাম— আর্টিষ্টদের পেমেন্ট যে হারে বেড়েছে তাতে স্যার একটা ছবির পেছনে প্রায় এক কোটি টাকা লগ্নি করতে হয়।'

'এক কোটি টাকায় ছবি হয়ে যাবে?'—

'জ্ঞি হবে। একটু টাইট বাজেটে করতে হবে। হাত-পা খেলিয়ে করা যাবে না।'

'হাত-পা খেলিয়ে করতে কত লাগবে?'—

'তার সঙ্গে আরো পঞ্চাশ লাখ ঝোগ দিন।'

'বেশ, আমি এক কোটি পঞ্চাশ লাখ খরচ করব।'

আজমল তরফদার কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। কিছু কিছু মানুষের হাতে টাকা আছে তা তিনি জানেন। সেই টাকা কোন পর্যায়ে আছে তা জানেন না। কালো টাকাকে সাদা করার জন্যে অনেকে ছবি করে। এই তদুলোকের কালো টাকার পরিমাণ কুকুর বনবান ব্যক্তিদের গা ধেকে একটা আলগা চাকচিক্য বিলিক দেয়, ইনার তুলেই। সাদায়টা চেহারা — মুখের চামড়ায় ভাঁজ। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে থাকায় ঝুলাটিচাব ঝুল চিচার বশে মনে হচ্ছে।

'স্যার আপনি কী ধরনের ছবি করতে চান? কমার্শিয়াল ছবি, না আর্ট ছবি?'

'পার্থক্য কী বুবিয়ে বলুন।'

'মানিকদার ছবি হল — আর্ট ছবি।'

'মানিকদার কে?'—

‘সভ্যজিং রায়। টলীগঞ্জে একটা ছবি করতে গিয়েছিলাম তখন উনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমাকে খুব শ্রেষ্ঠ করতেন।’

‘ও আছে।’

‘পথের পাঁচলী টাইপ ছবি হলে নাম হবে, তবে হলে ছবি চলবে না। ইন্টারভালের আগেই দর্শক বের হয়ে চলে আসবে। লগ্নি করা টাকা উঠে আসবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভালে ছবি যাবে, ছবির সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজক হিসেবে আপনিও যাবেন। এই পর্যন্তই...’

আজমল তরফদারের কথার মাঝখানেই শরবত চলে এল। বড় সাইজের প্লাস — স্থৎ সবজাত রাঙের পানীয়, উপরে বরফের টুকরা তাসহে। শরবত এসেছে একজনের জন্যে। মোবারক সাহেব বললেন, ‘নিন শরবত নিন।’

‘আপনি খাবেন না স্যার?’

‘জ্বি না। আর্ট ছবি সম্পর্কে তো বললেন, এখন কমার্শিয়াল ছবি সম্পর্কে বলুন।’

‘বলার কিছু মেই স্যার। ধূমধাঢ়াকা টাইপ ছবি। নাচ-গান-যৌনতা, যাত্রা চঙ্গের অভিনয়, কিছু ভাড়ামি, কিছু ঢাঁকের পানি ... বারমিশালি খিচুড়ি।’

‘লোকজন খিচুড়ি খাচ্ছে?’

‘না খেলে এত ছবি বানানো হবে কেন? খিচুড়ি খাচ্ছে। যারা সিনেমা হলে যাচ্ছে তারা খিচুড়ি ছাড়া অন্য কিছুই খাবে না।’

‘ছবি বানানো হচ্ছে কাদের জন্যে?’

‘রিকশাওয়ালা, প্রামের চাষী, কুলি, মজুর এদের জন্যে— এদের বাড়িতে টিভি নেই, বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই— সারাদিন পরিশুম করে সিনেমা হলে এসে সিটি বাজিয়ে একটু আয়াম পায়। ছবি বানিয়ে ব্যবসা করতে হলে এদের জন্যে ছবি বানাতে হবে। এখন স্যার ঠিক করতে হবে আপনি কাদের জন্যে ছবি বানাবেন?’

‘আমি ব্যবসায়ী মানুষ। দেড় কোটি টাকা যখন আমি ইনভেস্ট করব তখন আশা করব তিন কোটি টাকা প্রফিট।’

‘অবশ্যই করবেন।’

‘এখন আপনি বলুন আমার এই ছবি পরিচালনা করতে আপনি কত টাকা নেবেন?’

‘আমার এখন পর্যন্ত কোনো ছবি নৰম যায় নি। সব ছবি ব্যবসা করেছে। স্টার্ট তিনটা ছবির তিনটাই সুপারহিট হয়েছে। আগে আমি তিন লাখ করে নিতাম। ক্লাস্ট্রুটা ছবিতে সাত লাখ নিয়েছি। আপনিও তাই দেবেন।’

‘শরবত খেতে কেমন লাগল?’

আজমল তরফদার একটু হকচিয়ে গেলেন। হঠাতে শরবতের প্রসঙ্গ চলে এল কেন বুঝতে পারলেন না।

‘শরবত খুব ভালো লেগেছে। বাঁজ আছে।’

‘রেসিপিটো হচ্ছে — এক জগ পানিতে এক ছটাক তেঁতুল এবং এক টেবিল চামচ সৈঙ্ঘর লবণ, কুচিকুচি করে কাটা দু'টা কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, কয়েক দানা জিরা চমিশ

ঘণ্টা না নেড়ে রেখে দিতে হবে। চরিষ ঘণ্টা পর ছেকে আলাদা করতে হবে। তার সঙ্গে পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে আধা পেগ ভদকা দিতে হবে।'

'এর মধ্যে ভদকা আছে?'

'হ্যাঁ সামান্য আছে, আধা পেগেরও কম। আপনি খদ্যগ্রান করেন না?'

'তেমন অভ্যেস নেই। মাঝেমধ্যে হঠাৎ ... ছবির আলাপটা স্যার শেষ করি। আমার আরো কিছু জরুরি কাজ আছে।'

মোবারক সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'ছবির আলাপ অবশ্যই শেষ করবেন— আমি একটু শুধু ইন্টারফেয়ার কথব— আপনি যে বললেন সাত লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন; শেষ দু'টি ছবিতে তাই নিয়েছেন তা তো ঠিক না। আমি বৌজববর নিয়েই কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। এখন পর্যন্ত কোনো ছবিতেই আপনি তিন লাখ টাকার বেশি পারিশ্রমিক পান নি। শেষ ছবিতে চার লাখ টাকায় কন্ট্রাট সাইন করেছেন। পেয়েছেন দু'লাখ। দু'লাখ এখনো পান নি। না পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। আমি একজন ব্যবসায়ী, দেড় কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে হাত দেব — তালোমতো বৌজববর না করেই এগুব তা ভাবলেন কীভাবে? আপনি কি আরেক গ্লাস শরবত খাবেন?'

'জ্ঞি স্যার খাব।'

'এখন বলুন ছবি শেষ করতে আপনার কৃতিদিন লাগবে?'

আজমল তরফদারের চিন্তাবন্ধন একটু এগোমেলো হয়ে গেছে। স্কুল টিচারের মতো দেখতে এই লোক সহজে শোক না। কঠিন লোক। কঠিন লোকের হয়ে কাজ করার আনন্দ আছে। এবা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়।

আজমল তরফদার আরেকটা ব্যাপারে অস্থির বোধ করছেন। দ্বিতীয়বার শরবতের কথা তাকে বলা হয়েছে কিন্তু খবরটা ভেতরে দেয়া হয় নি। তারপরেও আজমল তরফদারের ধারণা যথাসময়ে শরবতের গ্লাস চলে আসবে। যদি আসে তাহলে ধরে নিতে হবে মোবারক হোসেন নামের এই লোক শুধু কঠিন ব্যক্তি না সূক্ষ্ম চাশের ক্ষমতা আছে এমন এক ব্যক্তি।

মোবারক সাহেব বললেন, 'আপনার বোধহ্য সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে। অভ্যাস থাকলে খেতে পারেন। আমিও মাঝেমধ্যে খাই।'

তিনি তাঁর সামনে ছোট্ট ডেক টাইপ টেবিলের ড্রয়ার খুলে আশ্ট্রে বের করে সামনে রাখলেন। আজমল তরফদার চুক্র কুঁচকে ফেললেন। কথাবার্তার ঠিক এই স্থানে ড্রয়ার থেকে আশ্ট্রে বের করা হবে এটা কি আগেই ঠিক করা?

মোবারক সাহেব একটু বুঁকে এসে বললেন, 'আমি আপনাকে দিয়ে ছবি বানাব বলে ঠিক করে রেখেছি। আপনার রেমনারেশন হিসেবে আমি পাঁচ লাখ টাকা ভেবে রেখেছি। এই অ্যামাউন্টের টাকার একটা চেক তৈরি করা আছে। আপনি বাজি থাকলে আজই আপনাকে দিয়ে দেব।'

'পুরোটা একসঙ্গে দিয়ে দেবেন?'*

'হ্যাঁ। এবং ছবি যদি সুপারহিট হয় তাহলে আপনাকে আরো দু'লাখ দেয়া হবে। আপনি কি রাজি আছেন?'

‘বাজি আছি।’

‘কতদিনে ছবি তৈরি করে দেবেন?’

‘আমি ছ’মাসে ছবির সেল্ফপ্রিন্ট দিয়ে দেব। এবং ইনশাআল্লাহ্ ছবি সুপার সুপারহিট করব। তবে একটা শর্ত— ছবি আমার মতো করে বানাতে দিতে হবে।’

‘তা দেব। শুধু টাকা-গয়সা আমার লোকজন হ্যান্ডেল করবে। এবং নায়িকা হিসেবে আমার পরিচিত একটি মেয়ে থাকবে।’ আপনি তাকে চেনেন। আপনার বর্তমান ছবিতে কাজ করছে। রেশমা।

‘রেশমা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি স্যার দেড় কোটি টাকা খরচ করছেন, ইচ্ছে করলে বর্তমানের সবচেয়ে’ হিট নায়িকা নিতে পারেন।’

‘আমি এই মেয়েটিকে নিতে চাচ্ছি।’

‘স্যার কিছু মনে করবেন না। ওর চেহারায় গ্ল্যামার নেই। ছবির জগতটাই হল গ্ল্যামারের।

‘ফিল্ম লাইনের মেকআপ দিনকে রাত করতে পারে। সামান্য গ্ল্যামার আনতে পারবেন না?’

‘সে রকম মেকআপম্যান স্যার আমাদের নেই।’

‘না থাকলে বাইরে থেকে নিয়ে আসুন। মাদ্রাজ থেকে আনুন, বোর্সে থেকে আনুন। অয়েজন মনে করলে হলিউড থেকে আনুন।’

শরবত চলে এসেছে। আজমল তরফদার অস্তির সঙ্গে শরবতের গ্লাস হাতে নিলেন। তাঁর কাছে মনে হল— পাঞ্জাবি গায়ে বসে থাকা ছোটখাটো মানুষটা আসলে মাকড়সার মতো। সুস্ম জাল ফেলে রাখে। সে জাল ঢোকে দেখা যায় না। জালে জড়িয়ে পড়ার পরই শুধু জালটা স্পষ্ট হয়।

‘আজমল সাহেব।’

‘ছুঁ স্যার।’

‘এই নিন আপনার চেক।’

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চেক বের হল। আজমল তরফদার হাত বাড়িয়ে যন্ত্রের মতো চেকটা নিলেন। চাপা গলায় বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?’

‘আর দেখা হবে না। আমার লোক আপনার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে।’

‘যদি বিশেষ কোনো অয়েজন পড়ে?’

‘অয়েজন পড়লে আমি আছি। আমি তো দেশেই থাকি। তবে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি।

‘ছবির গল্প কি আমিই সিলেক্ট করব?’

‘অবশ্যই আপনি করবেন।’

‘আপনাকে দেখানোর কোনো দরকার নেই?’

‘না।’

‘এফডিসির ক্যামেরা না নিয়ে প্রাইভেট পার্টির ক্যামেরা দিয়ে যদি কাজ করি আপনার আপত্তি আছে? জার্মানির এরি স্থি ক্যামেরা। নতুন এসেছে। এরা টাকা একটু বেশি নেবে কিছু কাজ হবে খুব ভালো।’

‘আপনি কাজ করবেন স্বাধীনভাবে। আমি বা আমার লোকজন কথনোই আপনার স্বাধীন কাজে বাধা দেবে না।’

‘ক্ষি আচ্ছা স্যার।’

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা সামান্য টলছে। সম্ভবত পর পর দু’পেগ ভদ্রকার জন্যে এটা হয়েছে। ভদ্রকা হঠাৎ করে ‘কিক’ দেয়। এটা কি ভদ্রকার কিক, না অন্য কিছু? স্কুল চিচারের মতো দেখতে এই লোকটা তাকে শার্টস করে দিয়েছে।

‘স্যার।’

‘বলুন।’

‘আর্টিষ্টদের সঙ্গে কি যোগাযোগ করব?’

‘ষ্টোরি লাইন ঠিক হবার আগে আর্টিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কীভাবে?’

‘এদিকের নিয়ম হচ্ছে স্যার — আগে আর্টিষ্ট ঠিক করা হয় তারপর ষ্টোরি লাইন।’

‘নিয়ম যা ভাই করবেন। তবে রেশমা মেয়েটিকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি ডিসিশান বদলাতেও পারি।’

‘যদি কিছু মনে না করেন স্যার তাহলে ডিসিশান বদলানো ভালো হবে। সম্পূর্ণ নতুন মেয়ে নেয়া এক কথা আব দিনের পর দিন এক্স্ট্রার রোল করছে এমন একজনকে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নতুন একজন মায়িকার জগৎ দর্শকদের কৌতৃহল আছে। এক্স্ট্রা মেয়েদের জন্যে দর্শকদের কৌতৃহল নেই। স্যার যাই?’

মোবারক সাহেব জ্বাব দিলেন না। আজমল তরফদারের পা সত্তি সত্তি টলছে। সিডি দিয়ে নামতে নামতে তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বার স্যার স্যার করেছেন। এত স্যার স্যার করার কোনো সরকার ছিল না। এটা তো আর মিলিটারি একাডেমী না যে স্যারের উপর দুনিয়া চলবে।

মোবারক সাহেব ঘরে এক বাসে আছেন। আজমল তরফদার নামের সিনেমার এই লোক তাকে খুব বিরক্ত করেছে। লোকটার চোখের কোনো অসুখ আছে। টকটকে লাল চোখ। তিনি লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিলেন। বিরক্তি অনেক স্ক্রিনে ধখন সে মিথ্যা কথা বলে তার পাঞ্জা বাড়াতে চাইল। লোভীর মতো লোকটি চেক নেয়াটাও চোখে লেগেছে।

পৃথিবীর সবচে অসুবির দৃশ্য হল লোতে চকচক করা ছোখটা আর সবচে সুবির দৃশ্য গভীর ময়তায় আর্দ্র প্রেমিকার চোখ। তিনি দীর্ঘদিন লোতে চকচক করা চোখ দেখছেন। দেখে দেখে তিনি খালিকটা ঝুঁস্ট। তবে লোভী স্মার্টসের একটা ভালো দিক আছে। কোনো লোভী মানুষই আঘাত্যার কথা ভাবে না। লোভ তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা জ্বোগায়। তিনি লোভী হলে তালো হত, বেঁচে থেকে আনন্দ পেতেন। এখন বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ পান না। আনন্দের জন্যে অভি মিস্টরের কিছু কাণ্ড তিনি করছেন। ভাতে

তেমন জাত হচ্ছে কি?

লোকমান উঁকি দিল। তিনি সহজে গলায় বললেন, 'কিছু বলবে জ্ঞেকম্বান?'

লোকমান বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি ডাঙ্কার সাহেবকে আসতে বলেছেন, উনি এসেছেন।'

'এখানে নিয়ে এস।'

'দুপুরের খাবার কি স্যার এখানে দেব?' ।

'দাও। ডাঙ্কারকেও আমার সঙ্গে খেতে বলেছিলাম।'

'ছু স্যার জানি।'

ডাঙ্কার আবদুর রশীদ ইএনটি স্পেশালিস্ট। মোবারক সাহেবের নাক-কান-গলার কোনো সমস্যা নেই। তবু রশীদ সাহেবকে তিনি প্রায়ই খবর দিয়ে আনেন কথা বলার জন্য। রশীদ সাহেব ভদ্রলোকের অনেক ক'টা বিলিত ডিপ্পি আছে কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। ইএনটি স্পেশালিস্টরা রোগী সামলাতে হিমশিল থান। রশীদ সাহেবের সেই সমস্যা নেই। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে খবরের কাগজ পড়ে। তিনি চৱাটা খবরের কাগজ রাখেন। চেমারে বসে চারটা খবরের কাগজ পড়ারই তাঁর সময় হয়।

এই মানুষটির বিশিষ্ট হবার ক্ষমতা অসাধারণ। মোবারক সাহেব মাঝেমধ্যে তাকে খবর দিয়ে আনেন। সামান্য ব্যাপারে ভদ্রলোককে বিশিষ্ট হতে দেখেন। তাঁর ভালো লাগে। মেডিকেল কলেজের একজন নামি অধ্যাপক তাকে তো আর যখন তখন খবর দিয়ে আনা যায় না। অসুস্থির একটা অজ্ঞাত দাঁড় করিয়ে খবর দিতে হয়। রোগ দেখানোর পর অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা চেক তাঁর হাতে দেয়া হয়। তিনি চেকটা হাতে নিয়ে খালিকক্ষ খুব হৈচৈ করেন— 'করেছেন কী পদিকাওয়ালারা জানলে তো নিউজ করে ফেলবে। অসম এই চেক আমি নিতে পারি না। আপনার যদি টাকা বেশি হয়ে থাকে— এবং দান করতে যদি কষ্ট হয় তাহলে দয়া করে টাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলুন। আমাকে নষ্ট করবেন না। আমি এমনিতেই নষ্ট।'

ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত চেকটা নেন। এবং ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলেন— 'চেকটা পেয়ে খুব উপকার হয়েছে, প্র্যাকটিস বলতে কিন্তুই নাই। চেমারে একজন আসিস্ট্যান্ট রেখেছিলাম তিনি মাস বেড়ে না দেয়ায় চলে গেছে। শুধু হাতে যায় নি, আমার ইন্সট্রুমেন্ট বস্তি নিয়ে পালিয়ে গেছে। শ্রিঃ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দামের ইন্সট্রুমেন্ট।'

রশীদ সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'মোবারক সাহেব আবুর্জ জীপনার কী হল?' ।

'চোক গিলতে ক'দিন ধরে সমস্যা হচ্ছে।'

'টেনসিলাইটিস নাকি? হাঁ করলে তো।'

'এক্সুনি হাঁ করে না। খালিকক্ষ গল্পজৰুর করুণ তারপৰ হাঁ করি।'

'আরে সর্বনাশ! এগুলো কি গোলাপ নাকি? আপনি ভুলেছেন কী ছাদে দেখি একেবারে আগুন লাগিয়ে ফেলেছেন। দুটা মিনিট সময় দিন আমি একটু বাগানটা দেখে আসি।'

রশীদ সাহেব গভীর আনন্দে গোলাপ দেখে বেড়ান। মোবারক সাহেব তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। রশীদ সাহেবকে তিনি ব্যবহার

করেন। ঠিক একইভাবে তিনি আরো অনেককে ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। প্রথম দু'বার তিনি ডিমতলার বারালা থেকে নিচে শাফিয়ে পড়তে গিয়ে পড়েন নি। আরো একবার এরকম কিছু হবে। সেই বার তিনি হয়তো সত্ত্ব সত্ত্ব শাফিয়ে পড়বেন।

জীবনের বৈচিত্রের জন্তে টেপীর মতো ঘেয়েদের তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন। তাদের কেউ কেউ অদ্ভুত সব কাও করে। কিছুক্ষণের জন্যে জীবনটা ইন্টারেষ্টিং মনে হয় — তারপর আবার সেই ক্লান্তিকর দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রঞ্জনী। একবার বাইশ-তেইশ বছর বয়সী একটি ঘেঁষে এসেছিল। সে তখে এবং লজ্জায় ফরে যাচ্ছে। বিহুনার এক কোনায় বসেছিল। ঘোবারক সাহেবকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। হড়বড় করে বলল, ‘আমি ঠাণ্ডা নহ্য করতে পারি না। আমি কিন্তু কাপড় খুলব না।’

সেদিন তিনি ধাণ খুলে হেসেছিলেন। ঘেয়েটিকে কাপড় খুলতে হয় নি। তিনি তাকে কফি বানিয়ে থাইয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে তাকে দশ হাজার টাঙ্কা দিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, ‘তোমার যথনই টাঙ্কা-পয়সার সমস্যা হবে তুমি আমার কাছে আসবে, টাঙ্কা নিয়ে যাবে।’

মেয়েটি আর আসে নি। তিনি খবর নিয়েছিলেন। ঘেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে স্থানীয় সঙ্গে জামানগুরে থাকে। সে সুখেই আছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই সুখে থাকে। অন্ত কিছু লোক থাকে অসুখী— তারা শুধু সুখী মানুষ যুক্তে বেড়ায়।

বুমুর আজ কুলে যাব নি। বিকেল তিমটায় সে আপাকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সে সকাল থেকেই অস্থি নিয়ে ঘুরছে। সেন্ট্রাল জেলের গেটে ডিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কুৎসিত লাগে। চারপাশে থাকে গান্দাগাদি ডিড়। দর্শনাৰ্থীৰ চেয়ে বাইরেৰ গোক বেশি। এৱা এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন যাবা দেখা করতে এসেছে তারাও অপৰাধী।

‘সবচে’ খারাপ লাগে যখন তারা পুরাদ ধৰে অপেক্ষা করতে থাকে এবং কয়েদিৰ পোশাক পৰা রফিক হাসিমুয়ে উপস্থিত হয়। পায়ে লোহৰ বালা। সেই বালা থেকে বানবন শব্দ হয়। একটা বালা থেকে এমন শব্দ হয় কেন বুমুর জানে না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস কৰতে ইচ্ছা কৰে। অশুটা হাস্যকৰ হবে তেবে কখনো জিজ্ঞেস কৰা হয় না।

প্রতিবারই রফিককে অন্যৱক্তম লাগে। শেষবাব দেখা কৰতে গিয়ে বুমুর একটা ধাক্কা খেল— রফিকের মুখভৰ্তি দাঢ়ি। দেখে মনে হয় মাদ্রাসার বাচ্চা হওলোনা। আজ গিয়ে কী দেখবে কে জানে। বুমুরের যেতে ইচ্ছা কৰছে না। তবু সে যাবে। সে না গেলে আপাকে একা একা যেতে হবে। বেচারি সবকিছু একা কৰবে তা কি হয়? মা কখনো যাবে না। দু' বছৰে একবাৰও যায় নি। মাসে একটা চিঠি লেখা যায়, সেই চিঠিও লিখবে না।

শাহেদা রান্নাঘৰে থাশাবাসন ধূঁচিলেন। বুমুর এসে তাঁৰ পাশে বসল। শাহেদা বললেন, ‘কী হয়েছে?’

বুমুর বলল, ‘ছুৱ ছুৱ লাগছে মা।’

‘ওয়ে থাক।’

বুমুর ছেট নিশাস ফেলল। তার ধারণা পৃথিবীৰ সব মা ‘ছুৱ ছুৱ লাগলু’^১ এই বাক শোনার পৰ সন্তানেৰ কপালে হাত দিয়ে ছুৱ দেখবে। শুধু তার মা অৰুজা^২ গলায় কৰবে ‘ওয়ে থাক’।

‘ভাইয়াৰ জন্যে কিছু বেঁধে টেধে দেবে?’

‘কী রাখব?’

‘পায়েস বা এই জাতীয় কিছু। সবাই খাবাৰ উদ্বাৰ নিয়ে যায়— আমৰা শুধু যাই খালি হাতে।’

‘তোদেৱ কিছু নিতে ইচ্ছে হলে নিজেৱা বেঁধে নিয়ে যা।’

ବୁମୁର ଆର କିଛୁ ବଲନ ନା । ତବେ ସେ ଉଠେ ଗେଲ ନା, ମା'ର ପାଶେ ବସେ ରହିଲ । ସବେ ତାରା ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ା ଆର କେଉ ନେଇ । ଆପା ଅଟିଛେ ଗେଛେ । ସେ ବାସାୟ ଫିରବେ ନା । ଏଫଡିସିର ଗେଟ ଥେକେ ଆପାକେ ତୁମେ ନିତେ ହବେ । ଜୟଦେବପୁର ଥେକେ ତାକେ ଏକ ଏକ ଯେତେ ହବେ ଏଫଡିସି, ଏଟାଓ ତାର ଜନ୍ମେ ବିବାଟ ସମୟ । ତାର ସାହମ ଏକେବାରେଇ ନେଇ । ଶୁଳ ଥେକେ ସେ ବାସାୟଙ୍କ ଏକା ଏକା ଆସତେ ପାରେ ନା । ତାର ଏକ ବାନ୍ଧବୀର ସଙ୍ଗେ ଆମେ । ମେହି ବାନ୍ଧବୀ ତାକେ ତାଦେର ବାସାର ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଯେ ତାରପର ତାର ବାସାୟ ଯାଏ । ଆଜ ଏକ ଏକ ଏଫଡିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କରେ ଯାବେ କେ ଜାନେ । ଯାଓଯା ଅବଶ୍ୟ ଥୁବ ମୋଜା । ଫର୍ମଗେଟେ ବାସ ଥେକେ ନେମେ ଏକଟା ରିକଶା ନିତେ ହବେ । ପାଂଚ ଟାକା ନେବେ ରିକଶା ଭାଡ଼ା । ଆପା କଥମୋ ରିକଶା ନେଯ ନା । ବାସ ଥେକେ ନେମେ ସେ ହେଟେ ହେଟେ ଯାଏ । ତାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନା । ତାକେ ଉପାୟ ନା ଥାକଲେଓ ପାଂଚ ଟାକା ଖରଚ କରତେ ହବେ ।

‘ମା ।’

‘ହଁ ।’

‘ଏକା ଏକା ଏଫଡିସିର ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବ କିଭାବେ ?’

‘ମିତ୍ତ ଯେତାବେ ଯାଏ ତୁଇଓ ମେହି ତାବେ ଯାବି । ତୋର ଜନ୍ମେ ଚୌକିଦାର ପାବ କୋଥାଯା ?’

‘ମବିନ ଭାଇକେ ବଲବ ଆମାକେ ପୌଛେ ଦିତେ ?’

‘ନା !’

‘ଅସୁରିଧା ତୋ କିଛୁ ନେଇ । ଉନାର ଯଦି କାଜ ନା ଥାକେ ...’

‘ତୋର ଯାବାର ଦରକାର ନେଇ । ତୋର ଆପା ଏକାଇ ଯାବେ ।’

‘ମବିନ ଭାଇକେ ତୁମ ଏତ ଅପହଞ୍ଚ କର କେନ ?’

‘ପଛଳ ଅପହଞ୍ଚରେ ବ୍ୟାପାର ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବାଇରେ ଏକଟା ମାନୁଷକେ ବିରଙ୍ଗ କରବି କେନ ?’

‘ଉନି ବାଇରେ ମାନୁଷ ନା, ଦୁଦିନ ପର ବିଯେ ହଛେ ଆପାର ସଙ୍ଗେ ।’

‘ଯଥନ ହବେ ତଥନ ଦେଖ୍ ଯାବେ ।’

ବୁମୁରକେ ରାନ୍ଧାଘରେ ବେଧେ ତିନି ଉଠେ ଗେଲେନ । ବାଲାତିତେ କାପଡ଼ ଭେଜାନେ ଆହେ । କାପଡ଼ ଧୂବେନ । ବୁମୁର ଏକା ଏକା ବସେ ରହିଲ । ତାର ଏବନ ଇଚ୍ଛା କରଛେ କଲଘରେ ମା'ର ପାଶେ ଗିଯେ ବସତେ । ସେ ଏକା ଏକା ବୈଶିକ୍ଷଣ ଥାକତେ ପାରେ ନା ।

ହଠାତ୍ ବୁମୁରେ ମନେ ହୁଲ ତାର ଯଥନ ବିଯେ ହବେ ତଥନ ତାର ସ୍ଵାମୀ ବୋରା ସ୍ଵର୍ଗମେଳାଯ ପଡ଼ିବେ । ସାରାକ୍ଷଣ ମେ ସ୍ଵାମୀର ସଙ୍ଗେ ଥାକବେ । କେ ଜାନେ ସେ ହୟତୋ ଅଫିଜ୍‌ଏଟ୍‌ଲେ ଯାବେ । ସ୍ଵାମୀ କାଜ କରଛେ— ସେ ତାର ସାମନେର ଚେଯାରେ ଚୁପଚାପ ବସେ ଆହୁ । ବୁମୁରେ ଏହିସବ ଭାବତେ ଥୁବ ଲଜ୍ଜା ଲାଗଛେ ଆବାର ନା ତେବେଓ ପାରଛେ ନା । ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏହିସବ ବ୍ୟାପାର ନିଯେ ଥୁବ ଭାବେ । ସେ ଯଥନ ଏକା ଥାକେ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ତଥନ ଭାବେ ତା ନା, ଯଥନ ଅନେକେର ସଙ୍ଗେ ଥାକେ ତଥନୋ ଭାବେ । ସବକେ ବୈଶି ଭାବେ କ୍ଳାସେ । ଆପା ଅଛୁ କଣ୍ଠାଛେନ । ସବାଇ ବୋର୍ଡ ଥେକେ ଅଛୁ ଟୁକରେ ଆର ମେ ଭାବହେ ଅନ୍ୟ କିଛୁ । ମେହି ଅନ୍ୟ କିଛୁ ମାଣେ ଥାରାପ କିଛୁ ନା, ଆବାର ଥାରାପତ୍ତ ଯେମନ— ଆପା ଯଥନ ଅଛୁ କରାଇଲେନ ତଥନ ମେ ଭାବହେ ... ଭାବହେ ନା ପରିକାର ଚୋଖେର ସାମନେ ଦେଖହେ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଏକଟା ଗାଡ଼ି ଶୁଲେ ଚୁକଳ । ଗାଡ଼ି ଥେକେ ଏକଙ୍ଗ ନାମଳ— ତାର

পরনে ধৰণৰে সাদা প্যান্ট, গায়ে চকলেট রঙের হাত্তয়াই শার্ট। শার্টের বঙ্গটা কটকট কৰে
চোখে লাগছে। তাকে দেখেই সে বের হয়ে আসছে। অঙ্কআপা কঠিন গলায় বললেন, ‘এই
বুমুর কোথায় যাচ্ছ?’

সে লজিজ্ঞ গলায় বলল, ‘আমাৰ হাসবেড় জমাকে নিচে এসেছে আপা।’

‘ও আছা যাও। তুমি কিন্তু বুব ক্লাস মিস দিছ।’

‘না গোলে ও বুব রাগ কৱবৈ।’

‘আছা যাও। উনাকে বলবে স্তৰীৰ পড়াশোনাৰ দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ওধূ সঙ্গে
নিয়ে মুৱলে হবে না।’

‘কিং আপা বলব।’

সে বের হয়ে ইনহন কৰে গাড়িৰ দিকে এগুল। তাৰপৰ বিৱৰণ গলায় বলল, ‘আছা
তোমাকে কতবাৰ না বলেছি চকলেট কালারেৰ এই শার্টটা পৰবৈ না। তাৰপৰেও পৱেছে?’

‘হাতেৰ কাছে পেয়েছি পৱে চলে এসেছি।’

‘তুমি এই শার্ট গায়ে দিয়ে থাকলে আমি কোথাও যাব না।’

‘তাহলে শার্ট খুলে ফেলি, শার্টেৰ নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি আছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পৰা
থাকলে যাবে?’

‘আবাৰ ঠাট্টা কৰছ?’

বুমুৱেৰ চোখে পানি এসে গোছে। সে সবাৰ ঠাট্টা সহ্য কৰতে পাৰে, এই মানুষটাৰ
ঠাট্টা সহ্য কৰতে পাৰে না। বুমুৱেৰ চোখে পানি দেখে সে লজিজ্ঞ ভঙ্গিতে এসে তাৰ হাত
ধৰল। বুমুৱ ঝাটকা মেৰে সেই হাত সৱিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, ‘হিঃ এই ভাৰে হাত
ধৰলে — ক্লাসেৰ সব মেছেৱা তাৰিয়ে আছে, আপাৰা দেখছে।’

‘দেখুক। তুমি কাদবে কেন?’

‘আমি এক শ বাৰ কাদব।’

‘আমিও এক শ বাৰ হাত ধৰব।’

এই সব ভাৰতে বুমুৱেৰ এত ভালো লাগে যা ভাৰা হয় সত্যিকাৰ জীবনে তা
কথনো ঘটে না। বুমুৱেৰ নিশ্চিত ধাৰণা তাৰ বিয়েই হবে না। আৱ হলোও পনেৱে
দোকানদাৰ টাইপ কাৱো সঙ্গে হবে। যাৰ গায়ে সবসময়ই ঘাম আৱ কড়া সিগাৰেটেৰ
গুৰু থাকবে।

দুপুৰে বুমুৱ কিছু খেতে পাৰল না। তাকে একা একা ঢাকা খেতে হবে। এটো চেনশানেই তাৰ
মুখে কিছু ভালো লাগছে না। কেমন যেন গা শুলাচ্ছে। বুমুৱ বলল, ‘মা তুমি আমাকে
বাসে তুলে দিয়ে আস।’

শাহেদা শাস্তি গলায় বললেন, ‘কোথাও তুলে নিতেন্তে রব না। তুই নিজে নিজে বাস
খুঁজে বেৰ কৱবি। নিজে নিজে উঠিবি।’

‘আছা। তাইয়াকে কিছু বলতে হবে?’

‘না।’

‘আপাকে কিছু বলতে হবে?’

‘ঘরে চা নাই, চিনি নাই।’

‘চা চিনি ছাড়া আর সব আছে?’

শাহেদা জবাব দিলেন না।

‘আমি কি এই কামিঙ্গটা পরেই যাব?’

‘তোর যা ইচ্ছা পর।’

‘কামিঙ্গটা যা নোখা হয়ে আছে। আপার একটা শাড়ি পরে ফেলব মা?’

শাহেদা জবাব দিলেন না। কথাবার্তা তিনি এমনিতেই কম বলেন— যত দিন থাক্কে কথাবার্তা আরো কমিয়ে দিজ্জেন।

বুরুর ঘর থেকে বের হয়ে অসীম সাহসী এক কাণ করল। মিলনের মেসে যাবার জন্যে একটা রিকশা ঠিক করে ফেলল। কাঞ্জটা অসীম সাহসিক এই কারণে যে মিলনকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে ঘোরতর সমস্যায় পড়বে। টাকায় টান পড়ে যাবে। ফার্মগেট থেকে নেমে এফডিসি যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। সে চিনে যেতে পারবে কিনা তাও এক সমস্য। বাইবে একা বেরোলেই তার শুধু সমস্য হয়। হয়তো স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিড়ে যাবে; তাকে যেতে হবে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে। তারচেয়ে বড় সমস্যাও হতে পারে— হয়তো ইতিমধ্যে মিল ভাই তার ঘর বদলেছেন। সে দরজির দোকানের সিড়ি বেয়ে উঠে দরজায় নক করল। দরজা খুলল— দেখা গেল ভয়ংকর দর্শন কয়েকজন চৌকিতে বসে তাস খেলছে। সবার সামনে মদের গ্লাস। বুরুর কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, মিলন ভাই কি এখানে থাকেন না। একজন চাপা গলায় উজ্জের দিল— ছি না খুকুমণি উনি থাকেন না। তাতে কী হয়েছে আমরা তো থাকি?

সেই লোকটা তারপর মাথা স্ফুরিয়ে কোনায় বসে থাকা এক লোককে বলল— ঐ যা তো মেয়েটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দে। মুখে রূমাল গুঁজে দে। নয়তো চিংকার করে বাড়ি মাথায় তুলবে।

বুরুর দরজার কড়া নাড়ল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মিলন বলল, ‘বুরুর তুমি ব্যাপার কি?’

‘আমি ঢাকা যাব মিলন ভাই।’

‘ঢাকা যাবে অতি উন্মত্ত কথা। এটা তো ঢাকা যাবার দোতলা কাস্ট না যে তুমি দোতলায় উঠে এলে।’

‘আপনি আমাকে ঢাকার বাসে ভুলে দেবেন।’

‘অতি উন্মত্ত তুলে দেয়া হবে।’

‘শুধু তুলে দিলে হবে না আপনাকে আমার সঙ্গে এফডিসির গেট পর্যন্ত যেতে হবে।’

‘ব্যাপার কি?’

‘আজ ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করার চেট। আপা আমাকে বলেছে আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে থাকতে। একা একা আমি কোথাও যাই না তবু ...’

‘কোনো সমস্যা নেই তোমাকে একা একা থেতে হবে না।’

‘আপনি কিন্তু আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবেন এবং আপনি যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন সেটা আপাকে বলবেন না।’

‘এত গোপনীয়তা কেন?’

‘আপাকে বললেই আপার কাছ থেকে মা জানবে। মা খুব রাগ করবে।’

‘এই ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই শ্রেষ্ঠ। আড়াইটাৰ সময় পৌছতে হবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে বোস কিছুক্ষণ, আমি ভাত খেয়ে নিই।’

‘আজ্ঞা।’

‘তুমি খেয়ে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমার সঙ্গে চারটা খাবে?’

‘খেতে পারি।’

‘আমি কি আপনার বিছানায় পা তুলে বসব মিলন ভাই?’

‘অবশ্যই বসবে।’

‘আপনার ঘরে চুকলেই কেমন শান্তি শান্তি ভাব হয়। কেন বলুন তো মিলন ভাই।’

‘ঘরটা ফাঁকা তো— কোনো আসবাব নেই— একটা চৌকি, একটা চেয়ার। চৌকিটে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটি মানেই শান্তি, ফাঁকা ঘর মানেই শান্তি। এই জন্যে আমার ঘরে পা দিলেই শান্তি শান্তি ভাব হয়।’

‘আপনি কি আপার সঙ্গেও এ বকম করে কথা বলেন, না আপার সঙ্গে অন্য বকম করে কথা বলেন?’

‘এ বকম করেই কথা বলি।’

‘সে কি আপনার কথা শুনে খুশি হয়?’

‘জিজ্ঞেস করি নি কখনো।’

‘জিজ্ঞেস করতে হবে! মুখ দেখেই তো বোৰা যায়।’

‘আমি তোমার আপার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারি না।’

‘আমিও পারি না।’

মিলন থবরের কাগজ বিছানে। টিফিল কেরিয়ারের বাটি বের করছে। খুমুকি বলল,
‘আমাকে কি আজ্ঞ একটু অন্য বকম লাগছে না?’

‘হ্যাঁ লাগছে।’

‘কেন অন্য বকম লাগছে বলুন তো?’

‘শাড়ি পরেছ এই জন্যেই অন্য বকম লাগছে।’

‘ও আপনি তাহলে লক্ষ করেছেন। আমি ভাবলাম দ্যুষ্য লক্ষ করেন নি।’

‘লক্ষ করব না কেন, করেছি।’

‘যারা দিনবাত বই পড়ে তারা বই ছাঢ়া আৰ কিছুই লক্ষ করে না।’

‘আমি কৰি।’

বুমুর বাসায় কিছু খেতে পারে নি। এখানে একগাদা ভাত খেয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, ‘মিবিন ভাই ঘুমে এখন আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আপনার শীতলপাটিতে ঘুমুতে নিশ্চয়ই শুব আরাম।’

‘আমার তো আরামই শাগে।’

‘আমি একদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে আপনার শীতলপাটিতে এসে আরাম করে ঘুমুব।’

‘বাসায় আরাম করে ঘুমুতে পার না?’

‘না, এতটুকু একটা বিছানা, আপা আর আমি দু’জন ঘুমাই। শুব চাপাচাপি হয়। মা’র বিছানাটা বড় কিন্তু মা’র সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। মা’র রাতে ঘুম হয় না তো— সারাবাত এপাশ-ওপাশ করে। মাঝে মাঝে কাঁদে। তাই গায়ের সঙ্গে গা লাগলে কী করে জানেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।’

‘বুমুর চল গুঠা যাক। এখন বওনা না হলে আড়াইটার সময় পৌছতে পারবে না।’

বুমুর অনিষ্টার সঙ্গে উঠল। মিবিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার সব সময়ই ভালো লাগে। আজ অন্য দিনের চেয়েও ভালো লাগছে।

‘মিবিন ভাই।’

‘ই।’

‘আপনাদের বিয়ে করে হবে?’

‘বুঝতে পারছি না। চাকরি বাকরি ছাড়া বিয়ে করা ঠিক হবে না।’

‘চাকরির আশায় বসে থাকলে আপনার আর বিয়ে হবে না।’

‘তোমার ধারণা আমার চাকরি বাকরি হবে না?’

‘ই।’

‘ভুল ধারণা। আমি বিরাট একটা চাকরি পাব। চা বাগানের ম্যানেজার। বাখলো টাইপ একটা বাড়ি থাকবে, মালী থাকবে, সুইপার থাকবে। চা বাগানে ঘোরার জন্যে শ্যাঙ্ক রোভার জিপ থাকবে। বিকেলে আমাদের অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে হাফপ্যান্ট আর টি শার্ট পরে লং টেনিস খেলব। জোছনা রাতে বাংলোর বারান্দায় বসে আমি আর তোমার আপা রকিং চেয়ারে বসে চুকচুক করে শেরী খাব এবং জোছনা খাব।’

‘শেরীটা কী? মদ?’

‘মদ বলবে না। মদ বললে মনে হয় ধেনো মদ। শেরী হল মিষ্টি মিষ্টি এক ধরনের পানীয় যার অন্তর্ভুক্ত পেটে গেলে জোছনা অনেক সুন্দর মনে হয়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।’

‘শেরী যারা খায় না তাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না?’

‘বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। সব বেঁচে থাকা একরকম না।’

বুমুর ছেট নিশ্চাস ফেলে বলল, ‘এইসব চাকরি আপনাকে মানাবে না মিবিন ভাই। আপনি যা আছেন, তাই আপনাকে মানাচ্ছে। ছেট সুন্দর একটা ঘর। পাটি বিছানো চৌকি ... যাহ।’

মিবিন হো-হো করে হেসে ফেলল। বুমুর অগ্রসূত হয়ে বলল, ‘হাসলেন কেন?’

‘আছে একটা কারণ। তোমাকে বলা যাবে না।’

আমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যা বলতে পারবেন না।'

'আচ্ছা যাও সত্তি কথাই বলব।'

'শাড়ি পরায় আমাকে কি খুব সুন্দর লাগছে?'

'যে সুন্দর সে যাই পরক তাকে সুন্দর লাগবে।'

'আমি কি সুন্দর মিলন ভাই?'

'অবশ্যই সুন্দর।'

'আপা বেশি সুন্দর, না আমি? সত্তি কথা বলতে হবে কিন্তু।'

'দু'জনের সৌন্দর্য দু'রকম। কোনো দু'জন ঝরপত্তী মেয়ের শেষের তুলনা চলে না। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কেউ নদীর মতো, কেউ অরণ্যের মতো, আবার কেউ আকাশের মতো।'

'আমি কীসের মতো?'

'ঝরনার মতো।'

'আব আগা!'

'সে অরণ্যের মতো।'

'অরণ্য বেশি সুন্দর না ঝরনা?'

'কারো কারো কাছে অরণ্য সুন্দর, কারোর কাছে ঝরনা।'

বুমুর অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে বলল, 'আপনার কাছে অরণ্য সুন্দর তাই না? এই জন্যেই চা বাগানের চাকরি আপনার এত পছন্দ, ঠিক না?'

মিলন জবাব দিল না। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে তাকাল।

বুমুর ঠিক আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে এসেছে। তখন থেকেই সে অপেক্ষা করছে। আপার বেঁরুবার নাম নেই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খুব অস্বস্তিকর। একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোনো একটা গাড়ি এফডিসির শেষের টুকনেই সবাই হমড়ি খেয়ে পড়ছে। নায়ক-নায়িকা কাউকে এক ঝলক দেখা যায় কিনা।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নায়ক-নায়িকারা আসছেন পর্দা ঢাকা গাড়িতে। অনেকের গাড়ির কাচ টিনটেড। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। একগাদা মানুষের শেষের বুমুর একাই মেয়ে। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এসে জিজ্ঞেস করল—সে এফডিসির শেষের টুকনে চায় কিনা। বুমুর ভীত গলায় বলল, 'না।'

'ভিতরে যাইতে চাইলে সমস্যা নাই—নিয়া যাব।'

'কিন্তু না, আমি যাব না।'

লোকটা তবু তাকে ছাড়চ্ছে না। তার আশপাশেই আছে। অদ্রপোকের মতো চেহারা কিন্তু মতলববাজ তা বোঝাই যাচ্ছে— নয়তো বুমুরকে এফডিসির শেষের নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ হবে কেন? সময় কতক্ষণ গেছে বুমুর বুবাতে পারছে না। তার সঙ্গে ঘড়ি নেই। লোকটাকে অবশ্যি জিজ্ঞেস করা যায়। তার হাতে বাহারি ঘড়ি।

আচ্ছা আপা কোনো কারণে বাসায় চলে যায় নি তো? যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে তো সে ভয়ংকর বিপদে পড়বে। একা একা ফিরতে হবে জয়দেবগুৰ। এই বদলোক নিশ্চয়ই তার পেছনে পেছনে যাবে।

‘বুমুর।’

বুমুর চমকে তাকাল। মিতু বের হয়েছে। তার মুখে মেকআপ। টেঁট টকটকে লাল। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে মেকআপ তোলারও সময় পায় নি।

‘তুই কি অনেকক্ষণ দাঢ়িয়ে আছিস?’

‘ইঁ। তোমার শাড়ি পরে চলে এসেছি। রাগ কর নি তো?’

‘না, শুধু শুধু রাগ করব কেন? চল যাই—— আয় একটা রিকশা নিয়ে নিই। একা একা আসতে ভয় লাগে নি তো?’

‘উঁ।’

‘বাহু! তোর তো সাহস বেড়েছে। কিছুক্ষণ ইঁটিতে পারবি বুমুর?’

‘ইঁ পারব।’

‘ভালৈ আয় একটু ইঁটি— বাংলামোটির পর্যন্ত গেলে শেয়ারের টেস্পে। পাওয়া যাবে।’

‘তুমি ঢাকা শহরের সব রাস্তাঘাট চেন তাই না?’

‘মোটামুটি চিনি।’

‘আপা বাসায় চিনি নাই, চা নাই।’

মিতু ছেটি নিশাস ফেলল। সেই নিশাস ফেলা দেখে বুমুর নিশ্চিত বুঝল আপার কাছে কোনো টাকা—পয়সা নেই।

‘তোর কি হাঁটিতে কষ্ট হচ্ছে বুমুর?’

‘উঁ।’

‘ইঁটা শাস্ত্রের জন্যেও তালো।’

‘তুমি তো আর শাস্ত্র ভালো রাখার জন্য হাঁটছ না, দায়ে পড়ে হাঁটছ। গাঢ়ি থাকলে তুমি কি আর শাস্ত্র রক্ষার জন্যে হাঁটতে?’

‘তাও ঠিক।’

‘আপা আজ খুব তোরবেলা বাড়িওয়ালা এসেছিল দু’টা পেঁপে নিয়ে। তুম শুগানের পেঁপে। মা’র সঙ্গে কথা বলল।’

‘বাড়ি ছেড়ে দিতে বলল?’

‘ইঁ।’

‘বেশি ভাড়ার ভাড়াটোর কাছে ভাড়া দেবে?’

‘তা বলল না। তার নিজের জন্যেই বাড়ি দয়কানে সংস্থাব বড় হয়েছে, ছেট ছেলে ছেট করে বিয়ে করে ফেলেছে—— এইসব কথা।’

‘মা কী বলল?’

‘মা কিছুই বলে নি, শুধু অনেছে।’

‘হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বুমুর?’

‘না।’

‘এই তো এসে পড়েছি।’

‘আমার কি সত্যি সত্যি টেস্পোতে করে একদল পুরুষের সঙ্গে গা ধেঁষাধেঁষি করে যাব? আমার তো তাবতেই বমি আসছে।’

‘তোকে এক কোনায় বসিয়ে দেব। তোর আব কারো সঙ্গে গা ধেঁষে যেতে হবে না।’

‘তোমার তো যেতে হবে।’

‘আমার এইসব গা সহা হয়ে গেছে।’

‘আমাদের মতো খারাপ অবস্থায় বোধহয় ক্ষেত্র নেই, তাই না আগা?’

‘থাকবে না কেন, আমাদের চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় লোকজন আছে। আমার পরিচিত এক মেয়ে আছে— তার নাম টেপী। ছবিতে ছোটখাটো রোল করে। বিরাট সৎসাৱ তাকে একা টানতে হয়। ছবিৰ পয়সায় তো হয় না— কিছু জখন্য কাজ তাকে করতে হয়।’

‘জখন্য কাজটা কী?’

মিতু জবাব দিল না। টেস্পোষ্ট্যাল্ড চলে এসেছে। সে বেনের হাত ধরে খালি টেস্পো খুজছে। সবার আগে উঠলে বুমুরকে কোনার দিকে নিরাপদ জায়গায় বসাতে পাববে।

রফিক দু’বোনকে দেখে হাসল। গতবার তার মুখভূতি দাঢ়ি ছিল। এখন নেই। মাথার চুলও ছেট ছেট করে কাটা। তার গায়ের রং ধৰণবে ফর্সা। অস্বা হালকাগোত্তলা শৰীর। জেলের বাইরে সাধারণ কোনো গোশাক পরিয়ে দিলেও তাকে দেখে সবাই বলবে বাহ ছেলেটা সুন্দর তো। আজ তাকে মোটেই সুন্দর লাগছে না। তার চোখের নিচে গায় হয়ে কালি পড়েছে। ঠোঁট ফ্যাকাসে। ঠোঁটের দু’ কোনায় ঘায়ের মতো হয়েছে। বুমুর কাঁপা গলায় বলল, ‘কেমন আছ ভাইয়া?’

রফিক মাথা নাড়ল। কিছু বলল না। তার স্বভাবও শাহেদার মতো। সেও কথা কম বলে।

‘ভাইয়া তোমার কি শৰীর খারাপ?’

‘একটু খারাপ।’

‘কী হয়েছে?’

‘রাতে ঘুম হয় না।’

মিতু বলল, ‘তোমাদের জেলে ডাক্তার নেই?’

‘আছে— ডাক্তার, হাসপাতাল সবই আছে।’

‘ঘুম হচ্ছে না, সেটা তাহলে ডাক্তারকে বল। কৃতদিন ধরে ঘুম হচ্ছে না?’

রফিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আঘৰের সঙ্গে বলল, ‘মা’র শৰীর কেমন?’

‘ভালো।’

‘না।’

‘এমনিতে শরীর ভালো?’

‘হঁ।’

‘তোরা চলে যা, আব কী, দেখা তো হল।’

মিতু বলল, ‘ভাইয়া তোমার শরীর কিন্তু খুবই খারাপ করেছে। তুমি ডাঙ্কারকে তোমার অসুখের কথা বল।’

‘বলব।’

‘ভাইয়া। তোমার জন্যে দু শ টাকা এনেছি। জেল গেটের জমাদার মোসাদ্দেক আলীর কাছে দিয়েছি। তোমার কাছে পৌছবে তো?’

‘অর্ধেক পৌছবে।’

‘আব তোমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছি।’

‘সঙ্গে ম্যাচ আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘দে ভাহলে একটা খাই।’

রফিক সিগারেট ধরাল। নীরবে টানছে। ঝুম্বুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। বলতে পারছে না। সে কোনোমতে বলল, ‘জেলখানায় থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না ভাইয়া?’

রফিক সিগারেটে লশা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ‘না কষ্ট আব কি? মানুষ খুন করে জেলে আছি— ঠিকই তো আছে। অনেকে কোনো অপরাধ না করে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল খাটছে। কষ্ট তাদের। তোরা চলে যা। মা’কে একবার তুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসিস। উনার বয়স হয়েছে, হট করে কোনদিন মরে যাবেন, আব দেখা হবে না।’

মিতু বলল, ‘পরের বার যখন আসি নিয়ে আসব। ভাইয়া আমরা এখন যাই?’

‘আচ্ছ মা। ঝুম্বুর ছয় মাসে এত বড় হয়ে গেল কীভাবে?’

ঝুম্বুর লঙ্ঘিত তঙ্গিতে বলল, ‘আমি বেশি বড় হই নি ভাইয়া। শাড়ি পরেছি এই জন্যে বড় লাগছে।’

‘মা যদি আমার কথা জানতে চায় তাহলে বলিস আমি ভালোই আছি। স্বাতে ঘূম হচ্ছে না এইসব বলার দরকার নেই।’

ফেরার পথে তারা মোটামুটি ফাঁকা বাস পেয়ে গেল। ঝুম্বুর ভানালার পাশে বসেছে। একটু পর পর চোখ মুছছে। ভাইয়াকে দেখে ফেরার পথে স্বেচ্ছার সময় সে এরকম কাঁদে। প্রতিবারই ভাবে সেও মা’র মতো হয়ে যাবে— কখনো স্বেচ্ছতে যাবে না। কখনো না।



আজমল তরফদার মোবারক হোসেনের চেক ফীণ সন্দেহ নিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল চেক ক্যাশ হবে না। বড়মোকদের নানান ধেয়াল হঠাত মাথায় ঢাপে আবার হঠাতই মিলিয়ে যায়। হঠাত উদয় ইওয়া শখ হঠাত মেটাই শালাবিক। চেক দেবার পর পরই হয়তো উন্নার শখ মিটে গেছে। উনি ব্যাংকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছেন এত নান্দারের চেক ক্যাশ করবেন না।

বড় চেকের সঙ্গে চিঠি দিতে হয়। ব্যাংক ম্যানেজার চিঠি না পেলে চেক ক্যাশ করেন না। অনেকে আবার আরেকে কাঠি সরস— কারেন্ট অ্যাকাউন্টে চেক না কেটে সেভিংস অ্যাকাউন্টে কাটে। আজমল তরফদার এইসব জটিলতার সঙ্গে পরিচিত। পরিচিত বলেই খানিকটা হলোও সন্দেহ নিয়ে তিনি ছিলেন। তিনি দিনের শেষের চেক ক্যাশ হবার কথা, ভারপরেও তিনি সাত দিন সময় দিলেন। সাত দিন পর ব্যাংকে টেলিফোন করে জানলেন চেক ক্যাশ হয়েছে।

তিনি তার পর পরই ঘোবারক সাহেবকে টেলিফোন করলেন। ছবি নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। সামান্য বিবের মতো ব্যাপারে এক লাখ কথা খুচ হয়— আর এ হল ছবি। কুড়িটা বিয়ে একসঙ্গে হবার মতো যন্ত্রণা— এখানে কথা বলতে হবে খুব কম করে হলোও কুড়ি লাখ।

টেলিফোন ধরলেন ঘোবারক সাহেবের পিএ। তিনি জানালেন, ‘স্যার ব্যস্ত আছেন। কথা বলবেন না।’

আজমল তরফদার বললেন, ‘আপনি কি আমার নাম বলেছেন? বলেছেন মে ফিল্ড ডাইরেক্টর আজমল তরফদার। আমি স্যারের জন্যে ছবি বানাচ্ছি।’

‘ছি আপনার নাম এবং পরিচয় বলা হয়েছে।’

‘আমি কি পরে টেলিফোন করব?’

‘করতে পারেন, তবে স্যার কথা বলবেন বলো মনে হয় না।’

‘আমার সঙ্গে কথা বলবেন না এরকম মনে হবার কোরণ কি?’

‘কারণ স্যার বলেছেন ছবি নিয়ে যা কথা বলার তা বলা হয়েছে, নতুন কিছু বলার নেই।’

‘আমার টেলিফোন নাবারটা রাখুন যদি স্যার কথা বলতে চান।’

‘দিন, টেলিফোন নাবার দিন।’

আজমল তরফদার টেলিফোন নাবার দিয়েছেন। কেউ সে নাবারে টেলিফোন করেন নি। ছবি তৈরি কোনো সহজ ব্যাপার তো না। স্লিপ রাইটারকে সিয়ে স্লিপ লেখাতে হবে, তাকে টাকা দিতে হবে; আর্টিষ্ট ঠিক করতে হবে, তাদের শিভিউল নিতে হবে; এফডিসিস্টেচ চার লাখ টাকার মতো জমা দিতে হবে— এই কাজগুলো করবে কে? আজমল তরফদার আবার টেলিফোন করলেন। পিএ ধরল।

‘আমি কিলু ডাইরেক্ট আজমল তরফদার...’

‘কথা শেষ করবার আগেই পিএ বলল, ‘স্যার ব্যত্ত আছেন, কথা বলতে পারবেন না।’

আজমল তরফদার বিরক্ত গলায় বললেন, ‘কথা তো আমাকে বলতেই হবে, গুরু লাগবে, চিনাটা লাগবে, গান লাগবে — এর প্রতিটির জন্যে...’

‘আমি যতদূর জানি এইসব দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে বলা হয়েছে।’

‘ডাইসাহেব সায়িত্ব তো পালন করব কিন্তু এর প্রতিটির জন্যে টাকা লাগবে। টাকা দেবে কে?’

‘টাকা স্যারের অফিস দেবে, স্যার তো দেবেন না। আপনি অফিসে চলে আসুন। কোন খাতে কত দরকার বলুন। ভাউচারে সই করে টাকা নিয়ে যান।’

‘কখন আসব?’

‘অফিস টাইচে আসবেন।’

‘অফিস টাইচ কখন?’

‘দশটা থেকে চারটা।’

‘এখন বাজাহে তিনটা, এখন আসতে পারিঃ?’

‘অবশ্যই পারেন।’

আজমল তরফদার উৎকণ্ঠা অফিসে চলে গেলেন। তার ধারণা ছিল তিনি নিভাস্টই বিশ্বাস অবহায় পড়বেন। এই টেবিল থেকে ঐ টেবিলে যেতে হবে। ম্যানেজার টাইপের একজন শেষ পর্যায়ে ভকনো মূরে বলবে, আপনার কী ডিমান্ড একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান আমরা ইনকোয়ারি করি— সংগ্রহালয়ের পরে এসে ঘোজ নেবেন।

বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার দেখলেন। ছবির কাগজপত্র এবং মাঝে পহসুর ব্যাপারে দেবাশোনার জন্যে আলাদা একজন লোক রাখা হয়েছে। তার নাম বিমলচন্দ্র হাঙ্গোদার। বাঢ়া ছেলে কিন্তু মনে হচ্ছে কাজকর্মে খুব সেয়াসা।

আজমল তরফদার ঘরে চুক্তেই সে তাকে অত্যন্ত যত্ন কর্তৃ বসাল। কফি খাবেন না চা খাবেন জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বিমল হাসিমুরে বলল, ‘ছবির কাজ কি স্যার জরুর হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ হবে। তবে ছবি তো আর স্মিতের খেলনা না যে চাবি দিলেই চলবে। গুরু, চিনাটা, এইগুলো লেখাতে হবে না?’

‘স্যার অবশ্যই হবে।’

‘এর জন্যে টাকা লাগবে না?’

‘চেক বই তো স্যার আমার কাছে। আপনি বলবেন, আমি চেক লিখব। আপনি যেদিন বলবেন আপনার সঙ্গে যাব — আর্টিষ্টদের বাসায় চেক পৌছে দেব। স্যার এখন বশন কী থাবেন? কফি দিতে বলি?’

‘বলুন।’

‘আমাকে তুমি করে বলুন স্যার।’

‘একডিসিভেটে টাকা জমা দিতে হবে। পি টাইপ ছবির জন্যে সাড়ে চার লাখ টাকা জমা দিতে হয়।’

‘ঐ টাকাটা স্যার জমা দেয়া হয়েছে।’

‘বল কী?’

‘শূটিং শিডিউলও স্যার নেয়া আছে।’

আজমল তরফদার বিশিষ্ট হলেন। বিমলচন্দ্র তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, ‘স্যার আমাদের অফিস হল দশটা-চারটা কিন্তু আপনার জন্যে আমি সারাঙ্গণই থাকব। যখন বলবেন তখন আপনার বাসায় উপস্থিত হব।’

‘বাসার ঠিকানা জান?’

‘জানি। ফাইলে আছে।’

কফি চলে এসেছে। কফির পেয়ালা হাতে নিতে নিতে আজমল তরফদার বললেন, ‘কিছু মনে করবে না বিমল, ছবির ফাল্ট কি আলাদা করা, নাকি মেইন ফাল্ট থেকে খরচ হচ্ছে?’

‘স্যার ছবির জন্যে আলাদা ফাল্ট দেয়া হয়েছে।’

‘মোট কত টাকা আছে সেই ফাল্টে? বলতে যদি কোনো বাধা না থাকে।’

‘বলতে কোনো বাধা নেই স্যার। মোট দেড় কোটি টাকা আলাদা করা হয়েছে। সেখান থেকে খরচ হয়েছে চার লাখ টাকা। ডাইরেক্টর হিসেবে আপনাকে টাকা দেয়া হয়েছে।’

আজমল তরফদার বললেন, ‘ছবির লাইনে তোমার কি কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে?’

বিমল হাসিমুখে বলল, ‘স্যার ছবির লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই কিন্তু আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। আমি খুব দ্রুত কাজ শিখতে পারি। বড় সম্পর্কের এই কারণে আমাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি যে কোনো নতুন প্রজেক্টে আমাকে দিয়ে পুরু করেন।’

‘ও আচ্ছা।’

‘ক্লিপ্ট লেখার টাকাটা আজ স্যার আপনি নিয়ে যান। কত দেব?’

‘এক লাখ টাকা দাও।’

‘একটা কথা বলব স্যার?’

‘বল।’

‘পুরো টাকাটা একসঙ্গে দিলে কাজ আদায় হবে না। আমরা যদি ভরতে দশ হাজার

টাকা দেই এবং বলি যেদিন স্ক্রিপ্ট শেষ হবে সেদিনই পুরো টাকা একসঙ্গে দেয়া হবে
তাহলে বোধহয় ভালো হবে।'

'কথাটা মন্দ বল নি।'

'আরেকটা কাজ স্যার করা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি স্ক্রিপ্ট যদি খুব ভালো
হয় এবং স্যারের যদি খুব পছন্দ হয় তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা বোনাস।'

'স্ক্রিপ্টের জন্যে কত টাকা ধরা আছে?'

'স্ক্রিপ্টের জন্যে দশ লাখ টাকা ধরা আছে।'

'এত টাকা!'

'স্ক্রিপ্ট তো স্যার একটা হবে না, বেশ কয়েকটা হবে। এর মধ্যে থেকে আমরা একটা
বেছে নেব।'

'কে বাছবে?'

'আপনি বাছবেন। আবার কে? স্যার আরেক কাগ কফি দেই?'

'দাও।'

'আপনার কি কোনো ট্রাইস্পোর্ট আছে স্যার?'

'ন্যূ না।'

'অফিস থেকে আপনি একটা গাড়ি রিকুইজিশন নিয়ে নিন। যতদিন কাজ করবেন
ততদিন পাড়ি চার্চিশ ঘন্টা আপনার সঙ্গে থাকবে।'

'ড্রাইভারসহ?'

'অবশ্যই ড্রাইভারসহ। আমি বলি কি স্যার আপনি বড় একটা গাড়ি নিন —
মাইক্রোবাস বা পিকআপ, এতে আপনার কাজের সুবিধা হবে।'

'বিমল, তোমার এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায়?'

'ন্যূ স্যার খাওয়া যায়।'

'আরেকটা কথা — মোবারক সাহেব নামের গোকটির কত টাকা আছে তুমি জান?'

'আমার কেননো ধারণা নেই স্যার।'

'কোনো আন্দাজ আছে?'

'আমি স্যার ছোট মানুষ, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আন্দাজ করি। বড় বিষয় নিয়ে
আন্দাজ করে সময় নষ্ট করি না। স্যার কি ধরনের গাড়ি নেবেন তা তো বললেন নন।'

'দাঢ়াও একটা সিগারেট থেঁয়ে নিই। বিমল তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

বিমল হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে আপনার আরো পছন্দ হ্যাতে যত দিন যাবে
ততই আপনি আমাকে পছন্দ করবেন।'

'কেন বল তো?'

'স্যার আমি যে কোনো কাজ খুব সুন্দর করে করতে পারি।'

'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি অহংকারী।'

'কিছু অহংকার তো স্যার থাকবেই। রাস্তার যে ভিত্তির অন্যদের চেয়ে বেশি ভিক্ষা
পায় সেও অহংকার করে, আমি কেন করব না?'

‘স্যার কি আবেক কাপ কফি খাবেন? আগেরটা খান নি এই জন্যে বলছি।’

‘দাও খাই আবেক কাপ।’

‘আপনার বোধহয় সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট আনিয়ে দেব?’

‘দাও।’

আজমল তরফদারের জন্যে নতুন করে কফি আনতে গিয়েছে, কিন্তু তিনি মনের ভূমে
ঠাণ্ডা, সরপড়া কফিতেই চুমুক দিয়ে ফেলেন।

‘বিমল!’

‘ছি স্যার?’

‘তোমাদের এই বড় সাহেবের, আই মিন মোবারক সাহেবের ছবি বানানোর শখের
পেছনের কারণটা কি?’

‘ব্যবসা। ছবির ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা। বাংলাদেশে পাঁচ শ'র মতো সিনেমা
হল— প্রতি হল থেকে গড়পড়তা দশ হাজার টাকা পেলেও প্রথম রানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা
উঠে আসে। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি উনি সিনেমা হলও বানাবেন।’

‘সিনেমা হল বানাবেন?’

‘জায়গা নেয়া হয়েছে, আর্কিটেক্টকে ডিজাইন করতে বলা হয়েছে।’

‘বল কী?’

‘স্যার উনি খুব শোছানো মানুষ।’

‘তাই তো দেখছি। আমার ধারণা ছিল ছবি তৈরির ব্যাপারটা হট করে মাথায়
এসেছে।’

নতুন কফি এসেছে। পিরিচে বেনসন এন্ড হেজেস-এর প্যাকেট এবং দেশলাই।
আজমল তরফদার বলেন, ‘বিমল তুমি সিগারেট খাও?’

‘জি স্যার খাই।’

‘নাও সিগারেট নাও।’

‘আপনার সামনে থাব না স্যার।’

‘খাও খাও ফিল্ম শাইনে সব সমান।’

বিমল সিগারেট ধরাল না। আজমল তরফদার সিগারেট ধরিয়ে তৃষ্ণির সঙ্গে কফিতে
চুমুক দিলেন। বিমল বলল, ‘স্যার যারা কোটি কোটি টাকা উপর্যুক্ত করে আপনাকেও যে
তাণের জোরে সেটা করে তা কিন্তু না। ভাগ্য থাকে তাদের হাতের মুঠোয় ভাগ্য নিয়ে
তারা খেলা করে। পৃথিবীতে যারা বিলিওনিয়ার আছে তারা কেবল কারণ ছাড়াই
বিলিওনিয়ার হয় নি।’

‘তুমি কী বলতে চাছ বুঝতে পারছি না।’

‘আমি বলতে চাই— বড় সাহেব হট করে কোলেক্ষন কিছু করেন না। তিনি যখন
ছবির জগতে এসেছেন তখন ধরে নিতে হবে এই জগতিতে নি নিয়ন্ত্রণ করবেন।’

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, ‘আমি বিলিওনিয়ার না, সামান্য
ফিল্ম মেকার— আইএ পাস বিদ্যা। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, শুনে রাখ। ছবি

বানানোর এই খৌক তোমার বড় সাহেবের হঠাতে করেই হয়েছে। আমাদের ছবি পাড়ার একটা মেয়ে—আজ্জিবাজে টাইপের মেয়ের জন্যে এটা তার শিফট। তবে খানু ব্যবসায়ীরা শিফট থেকেও লাভ করে। যে কারণে এত আটোট বেঁধে ছবিতে নামা হচ্ছে। রেশমা নামের বশতে গোলে পথের-কুকুরী সুপারষ্টার হিসেবে বের হয়ে আসবে। সে তার পুরস্কার পেয়ে গেল। একই সঙ্গে ছবির বাণিজ্যও হল।'

বিমল চুপ করে আছে। কী একটা বলতে গিয়েও খেয়ে গেল। আজমল তরফদার বললেন, 'বিমল তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলে আমি এই কথাগুলো বললাম।'

বিমল বলল, 'স্যার আপনাকেও আমার মনে ধরেছে। ছবি বানানোর ব্যাপারে আমাদের চিমওয়ার্ক খুব কাজে আসবে। আপনি গাড়ি বিকুঁইজিশন না করেই উঠে যাচ্ছেন। কী গাড়ি নেবেন তা তো বলেন নি। আরেকটু বসুন— কাজটা শেষ করি। আপনি কিন্তু দ্বিতীয়বারের কফিটাও খান নি— ঠাণ্ডা করে ফেলেছেন।'



মুমুর দরজা খুলে দেখে বাড়িওয়ালা চাচা নিজামউদ্দীন। আজো তাঁর হাতে দু'টা পাকা পেঁপে। তার আগের বার দিয়ে যাওয়া পেঁপে দু'টির একটা এখনো পড়ে আছে। ফেলে দেয়াই উচিত। মিষ্টি-টিষ্টি কিছু নেই — তিতকুট স্বাদ। এত বড় একটা পাকা পেঁপে ফেলতে যায় লাগে বলে ফেলা হয় নি।

নিজামউদ্দীন হাসিমুখে বললেন, ‘কেমন আছ গো মা?’

মুমুর বলল, ‘ভালো।’

‘আপা আছে?’

‘ছিঁ না।’

‘ফিরবে না?’

‘আজ রাতে ফিরবে না।’

‘ছবির শাটিং কি সারাবাত ধরেই চলে?’

‘সব সময় চলে না, মাঝে মাঝে চলে — যখন ছবির কাজ দ্রুত শেষ করতে ইয় তখন সারাবাত কাজ করতে হয়।’

‘হতে পারে। ছবির লাইনের কাঞ্জকারবার তো জানি না। তোমার আপার সঙ্গে দরকার ছিল। যাই হোক মা আছে না?’

‘আছে। উনার শরীরের ভালো না — শয়ে আছে।’

‘আপার কথা একটু সিয়ে বল। দু'টা কথা বলে চলে যাব। নাও পেঁপে দু'টা নিয়ে যাও।’

‘আপানি বসুন।’

নিজামউদ্দীন বসতে কসতে বললেন, ‘ঘরে পান থাকলে আমাকে ক্ষেত্ৰ পান দিও তো মা। রাতে ভাত খেয়েই বের হয়েছি — মুখ মিষ্টি হয়ে আছে।’

‘ঘরে পান নেই, মা পান খায় না।’

‘তাহলে থাক। কিছু লাগবে না।’

শাহেদা চাদর গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এলেন।
নিজামউদ্দীন মধুর গলায় বললেন,
‘আপার শরীরটা নাকি বারাপ?’

‘না তেমন কিছু না। সামান্য গা গরম।’

‘সামান্য বলে অবহেলা করবেন না। আপনার আমার খা বয়স— এই বয়সে সামান্য বলে কোনো কিছুকেই অবহেলা করতে নেই। নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যাই হোক আপা— মেয়ের সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন? এই যে বাড়ির বিষয়ে—বাড়িটা যে আমার লাগে।’

‘এখনো বলি নি।’

‘একটু যে তাড়াতাড়ি করতে হয় আপা। মাস শেষ হতে তো বাকি নেই।’

‘ভাই সাহেব। আমাদের তো সময় দিতে হবে। বললেই তো বাসা পাওয়া যায় না। দু'টা মেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানেও তো উঠতে পারি না।’

‘আমি নাচার! সামনের যাসের ১ তারিখ থেকে বাড়ি আমার লাগবেই।’

শাহেদা কিছু বললেন না। নিশাস ফেললেন। নিজামউদ্দীন বললেন, ‘মানুষের সমস্যা মানুষ ছাড়া কে দেখবে? মানুষই দেখবে। আমি তো আপনাদের সমস্যা অনেকদিন দেখলাম। এখন আপনারা আমার সমস্যা একটু দেখুন।’

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘আমার কোন সমস্যা দেখেছেন? আমি তো বিনা ভাড়ায় আপনার বাড়িতে থাকি নি। যথানিয়মে ভাড়া দিয়েছি। ভাড়া দিতে কখনো কখনো দেরি হয়েছে কিন্তু দেয়া হয়েছে।’

‘ভাড়ার কথা তো আপা আসছে না। আপনাদের বাড়ি দেয়ার জন্যে কতবর্কম সমালোচনা সহ্য করেছি। দশ জনের দশ রকম কথা।’

‘কী কথা?’

‘বাদ দেন সব কথা শুনতে নাই।’

‘না না বলুন কী কথা শুনেছেন?’

‘এই যে ধরন মিতু ছবিতে কাজ করে। এইসব কাজের ধরন-ধারণ তো আলাদা। রাত-বিরাত পার করতে হয়। এমনও হয়েছে— দু'দিন-তিন দিন মেয়ের ঘোঁজ নাই। যে কাজের যে দস্তুর। সাধারণ মানুষ তো এইসব বুঝে না। অথবা— কুকথা বলে।’

শাহেদা কাঁপা গলায় বললেন, ‘আমার মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে? আমার মেয়েকে নিয়ে— যে মেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে দিনবাত খেটে মরছে সেই মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে?’

‘এই তো আপা আপনি মনটা খারাপ করলেন। মন খারাপ করার কিছু নাই। দুনিয়ার এই হল হল। মানুষের মুখ তো আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। এই ‘পৃথিবীতে প্রবচে’ খারাপ জ্ঞান হল পায়খানা। মানুষের মুখ সেই পায়খানার চেয়েও খারাপ। পায়খানার দরজা বন্ধ করা যায়, তালা দেওয়া যায় — মানুষের মুখ বন্ধ করা যায়নি।’

শাহেদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, ‘আমি আপনার স্বাক্ষি ছেড়ে দেব। এক তারিখের আগেই ছাড়ব। আমার মেয়ের কারণে আপনাকে কেবল শুনতে হচ্ছে এটা যদি আপে জানাতেন আগেই ছেড়ে দিতাম।’

নিজামউদ্দীন খুশি খুশি গলায় বললেন, ‘তুচ্ছ ক্ষাপার আপনার কানে তুলব কেন? আমার একটা বিবেচনা আছে না। আমার তো চোখ আছে আমি দেখছি না— একটা বাচ্চা মেয়ে সংসার টানছে। বড় ভাই মানুষ খুন করে জেলে বসে আছে। লোকে কী বলে না

বলে সেটা শুনলে দুনিয়া চলত না। শোনেন একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা না শুনলে বুঝতে পারবেন না।'

'থাক বটনা শুনতে হবে না।'

'আপা শোনেন। শোনার দরকার আছে— গত জুম্বাবারে জুম্ব পড়ে বাসায় ফিরাছি। ইসলাম সাহেব পথে আমাকে ধরলেন। ইসলাম সাহেব আমার ভাড়াটে— অর্থাৎ ব্যাথকের ম্যানেজার। আমাকে বললেন—

'আমার শ্রীরাটা ভালো না। কিছু শুনতে ভালো লাগছে না।'

'থাক তাহলে। মানুষের কানকধা যত কর শোনা যায় ততই ভালো। শুনলেই বিপদ, আপা তাহলে উঠিঃ?'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তাহলে এই কথা রইল— মাসের তিন তারিখ ইনশাল্লাহ ঘর থাণি করে দিচ্ছেন।'

'বললাম জ্ঞো দিব।'

'আলহুমদুল্লাহ। সত্যি কথা বলতে কি আপা এক শ একটা পাপ করার পর নেকে ভাড়াটে হয়। টু লেট সাইন খুলাগে ভাড়াটে পাবেন না। যখন ভাড়াটে শুনতে যাবেন এরা উঠবে না। যেন তাদের বাপের বাড়ি...'

শাহেদা বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। রাতের রান্না কিছু হয় নি। ঝুমুরকে বলেছেন একার জন্যে চারটা চাল ফুটিয়ে ডিম ভেজে খেয়ে নিতে। ঝুমুর এখনো চুলা ধরায় নি। শাহেদা ক্লান্ত গলায় ডাক্তান, 'ঝুমুর।'

ঝুমুর দরজা ধরে দাঁড়াল।

'তোর নিজের জন্যে দু'টা ভাত রেঁধে ফেল, আমি খাব না।'

'আমিও খাব না।'

'রাতে না খেয়ে থাকবি?'

'হঁ।'

'কর যা ইচ্ছা। তোর আপা কি বলেছে রাতে ফিরবে না?'

'না— সারারাত স্যাঁটি চলবে। তোমার কি মাথায় যত্নণা?'

'হঁ।'

'মাথা টিপে দেব?'

'কিছু করতে হবে না। তুই ঘরের বাতি নিতিয়ে চলে যা।'

'মশারি থাটিয়ে দেব? মশা আছে তো।'

'যেতে বললাম না।'

ঝুমুর মা'র ঘর থেকে চলে এল। তার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ন স্টারিখ থেকে। বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না। এমনিতে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে কিন্তু বই নিয়ে বসলেই শুধু হাই উঠে।

ঝুমুর খাটের উপর পা তুলে বসল। বই নিয়ে বসন্তীক বসবে ন। ঠিক করতে পারল না। কারো সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে— গল্প করার মানুষ নেই। কথা শুনতে ভালবাসে এমন কোনো ছেলের সঙ্গে বিঝে হলে সে বেঁচে যায়। সমস্ত পুরুষদেরকে ঝুমুর তিন ভাগে ভাগ করেছে—

এক, এরা কথা শনতে ভালবাসে। স্বামী হিসেবে এরা আদর্শ;
দুই, এরা কথা বলতে ভালবাসে। স্বামী হিসেবে এরা মোটামুটি।

তিনি, এরা কথা শনতেও ভালবাসে না, বলতেও ভালবাসে না। স্বামী হিসেবে এরা ভয়াবহ।

মবিন ভাই কোন শ্রেণীর? প্রথম শ্রেণীর? পুরোপুরি না। তিনি কথা শোনার চেয়ে
বলতে বেশি পছন্দ করেন। স্বামী হিসেবে মবিন ভাইকে আদর্শ বলা যাবে না। উনার বেশি
বুদ্ধি। স্বামীদের ক্ষম বুদ্ধি থাকা ভালো। বেশি বুদ্ধির মানুষেরা নানান ধরনের চালাকি করে।

‘বুমূর!’

‘জি।’

‘এক গ্লাস পানি দিয়ে যা।’

বুমূর উঠে শিয়ে পানির গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে গেল। বাতি ঝালাল।

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘বাতি নেতো। বাতি জ্বলেছিস কেন?’

‘অঙ্কুরে পানি থাবে কীভাবে?’

বুমূর লক্ষ করল পানির গ্লাস হাতে নিতে পিয়ে শাহেদার হাত কাঁপতে শাপল। বুমূর
বলল, ‘মা তোমার কি জ্বর বেড়েছে?’

‘জানি না। বাতি নিতিয়ে চলে যা।’

‘তুমি আমার সঙ্গে অকারণে এত রাগারাগি করছ কেন? বাড়িওয়ালা চাচার কথা শনে
তুমি রেগেছ— সেই রাগ বাড়ছ আমার উপর। মানুষ কত কথা বলবে তাই শনে রেগে
যেতে হবে?’

‘কৃৎসিত কথা শনব তার পরেও রাগব না?’

‘কৃৎসিত কথা তো আমি সারাক্ষণই শনি— আমি কি রাগ করি? রাগ করি না। আমি
খাকি আমার মতো।’

‘তুই সারাক্ষণ কৃৎসিত কথা শনিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে বলে?’

‘কুলের মেয়েরা বলে— সেদিন জিওফি আপা আমাকে আড়ালে ভেকে জিজ্ঞেস
করলেন।’

‘কী জিজ্ঞেস করলেন?’

‘হেনতেন নানান কথা, সৎসার চলে কী করে? বড় বোন কী কৰে? এইসব
হবিজ্ঞাবি।’

‘কই আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলিস নি।’

‘তোমাকে শখ শখ বলব কেন? ভাছাড়া আমি এক জনের কথা আরেক জনকে বলি
না।’

‘বুমূর তুই আমার কাছে এসে বোস।’

‘কেন?’

‘বসতে বলছি বোস।’

‘তুমি এমনভাবে বলছ যে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে মারবে।’

‘মারব না, কাছে আয়। বোস এখানে — তোর আপার সঙ্গে তুই তো উটেউট করে অনেক কথা বলিস। সে কি কখনো তোকে গোপন কিছু বলেছে।’

‘না। আপার হতাব হল চূপচাপ থাকা। বকবক যা করার আমিই করি। আপা শুধু জনে যায়। আপা পুরুষ মানুষ হলে খুব ভালো শামী হত।’

শাহেদা তুকু কুঁকে তাকালেন। কুমুর বিরক্ত গলায় বলল, ‘ভূমি এভাবে তাকিয়া না— তোমাকে আমাদের জিওফি আপার মতো লাগছে।’

শাহেদা চাপা গলায় বললেন, ‘তোর আপার সঙ্গে রাতে যখন ঘুমাস সে কিছুই বলে না?’

‘ঘুমের মধ্যে কথা বলবে কীভাবে? আপা ক্লান্ত হয়ে থাকে, মরার মতো ঘুমায় — মাঝে মাঝে ...’

‘মাঝে মাঝে কী?’

‘মাঝে মাঝে ঘুম ডেঞ্জ বিছানায় উঠে বসে। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাট করে কাঁদে।’

‘তুই তখন কী করিস?’

‘কিছুই করি না। ভান করি যেন মরার মতো ঘুমুছি।’

‘ও কেন কাঁদে?’

‘আমি কী করে জানব কেন কাঁদে? সে যেমন রাতে মাঝে মাঝে কাঁদে, ভূমিও কাঁদ। ভূমি কেন কাঁদ সেটা যেমন আমি জানি না, আপা কেন কাঁদে সেটাও জানি না— জানতে ইচ্ছাও করে না।’

শাহেদা ক্লান্ত গলায় ধ্বনেন, ‘নেট ইজ। করাব কেন? সংসারের কোনে কিছু নিয়ে তো তোকে ভাবতে হচ্ছে না। দিব্যি খাচ্ছিস, ঘুমুছিস— গাঁথে বাতাস লাগিয়ে ঘূরছিস।’

‘ভূমি আমার উপর শুধু শুধু রাগ করছ। রাগ করার মতো যখন কিছু করব তখন রাগ কোরো। তোমাকে বেশি দিন অপেক্ষাও করতে হবে না। রাগ করার মতো কিছু খুব শিগগিরই করব।’

‘সেটা কী?’

‘টেষ্ট পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে শোল্যা থাব।’

শাহেদা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। কুমুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘মাতোমাকে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন— আপা কী করে সংসার চালাচ্ছে সেটা ভূমি খুব ভালো করেই জান। ভূমি ভান করছ ভূমি কিছু জান না। আমিও ভান করছি আমি কিছু জানি না। এটা কি মা ঠিক হচ্ছে?’

শাহেদা তাকিয়ে আছেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেৰে তীর হাত-পা প্রস্তর করে কাঁপছে। কুমুর উঠে দাঁড়াল। শাস্তি ভঙ্গিতে ঘরের বাহি পিভিসে নিজের ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে চলে গেল বারান্দায়। বারান্দায় দেয়াল থেবে শোড়া পাতা। দেয়ালে হেলান দিয়ে কুমুর বসেছে।

বাইরে সুন্দর জোছনা। খানিকটা জোছনা বারান্দায় এসে পড়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা নেমেছে। বারান্দায় সুন্দর পাতার নকশা। বাতাসে পাতা কাঁপছে — জোছনার নকশাও কাঁপছে। কুমুর সেই অপূর্ব নকশার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

ভেতর থেকে শাহেদো ডাকলেন, ‘যুমুর যুমুর।’

যুমুর জবাব দিল না। সে চোখের পানি মুছে খালি চেয়ারটা নিজের পাশে টেনে আনল। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে— খালি চেয়ারে তার স্বামী বসে আছে। সে তাঁর পায়ের কাছাকাছি বসেছে। যুমুর বলল, ‘যুমাবে না?’

সে বলল, ‘না।’

‘যুমাবে না কেন? রাত তিনটা বাজে।’

‘তুমি বড় বিরক্ত কর যুমুর। দেখছ না জোছনা দেখছি।’

‘তুমি কি কবি যে তোমাকে ইঁ করে জোছনা দেখতে হবে?’

‘হ্যাঁ আমি কবি।’

‘কবিরা জোছনা দেখে না। তারা তাদের স্তৰীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।’

‘কে বলেছে তোমাকে?’

‘আমি জানি। এখন তুমি আমার দিকে তাকাও।’

‘উফ! তুমি কী যে বিরক্ত কর!’

‘আমার দিকে না তাকালে আমি আরো বিরক্ত করব।’

সে যুমুরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই হেসে ফেলল। এতো সুন্দর করে সে হাসল যে হাসি দেখে যুমুরের চোখে পানি এসে গেল।

ভেতর থেকে শাহেদো আবারো ঝাণ্ট গলায় ডাকলেন, ‘যুমুর।’

যুমুর কঠিন শব্দে বলল, ‘ডাকাডাকি করবে না মা, আমি আসব না।’

না যুমুর যাবে না। সে বারান্দায় বসে থাকবে—সায়ারাত বসে থাকবে। পাশে বসে থাকা মানুষটার সঙ্গে কথা বলবে। ওকে একা রেখে সে যেতে পারবে না। পাশে বসা মানুষটা বলল, ‘পানি খাব যুমুর।’

যুমুর বলল, ‘মা তুমি পানি খাবে না। পানি খাবার কথা বলে তুমি আমাকে ভেতরে পাঠাতে চাচ্ছ। ভেতরে গেলেই মা’র কাছে যেতে হবে। মা’র কাছে গেলে আমি আর আসতে পারব না। তোমার সঙ্গে গল্ল করাও হবে না।’

‘মা’কে তুমি ভালবাস না?’

‘না আমি কাউকেই ভালবাসি না।’

‘আমার ধারণা তুমি রাগ করে এ রকম কথা বলছ— আসলে তুমি সবাইকে ভালবাস।’

‘তোমার ধারণা নিয়ে তুমি বসে থাক।’

‘কী ব্যাপার তুমি দেবি আমার উপরও রাগ করছ।’

‘আমি সবার উপরই রাগ করছি।’

‘কিছুক্ষণের জন্যে কি রাগ বস্তু করা যায়?’

‘যায়।’

‘বেশ, রাগটা খানিকক্ষণের জন্যে ধামাচাপা দাও ধামাচাপা দিয়ে আমার হাত ধরে বস। গল্ল কর।’

‘কী গল্ল?’

‘যে কোনো গল্ল। তোমার বাবার গল্ল বল।’

‘বাবার কোনো পর্য নেই। ভালোমানুষ ছিলেন—হঠাতে একদিন মরে গেলেন। যাস।’

‘তোমাদের ভালবাসতেন না?’

‘বাসতেন।’

‘খুব ভালবাসতেন, না ঘোটাঘুটি?’

‘ভাইয়াকে খুব ভালবাসতেন। ভাইয়াকে ডাকতেন ভোঞ্চল সিং। ছেটবেলায় গাদা গোবদা ছিল তো—ভোঞ্চল সিং নাম দিয়েছিলেন—বড় হয়েও সেই নাম। ভাইয়া কত রাগ করেছে, কান্নাকাটি করেছে, লাভ হয় নি। বাবা ভোঞ্চল সিং ডাকবেই।’

‘তোমার ভাইয়া বাবাকে কেমন ভালবাসত?’

‘ভাইয়া ভালবাসত টাপ্ত না, বাবাকে এড়িয়ে চলত। বাবার খুব চিড়িয়াখানা দেখাব শখ। আমরা ঢাকায় থাকতাম, উনি থাকতেন সিলেটের জঙ্গলে। যতবার ঢাকার আসতেন ঘ্যান ঘ্যান করতেন, ভোঞ্চল সিং চল যাই চিড়িয়াখানা দেখে আসি। ভাইয়া যাবে না। কত সাধাসাধি। শেষটায় মন খারাপ করে আমাকে নিয়ে যেতেন। বাবা ঢাকা এসেছেন অথচ চিড়িয়াখানায় যান নি এরকম কথনো হয় নি। বাবা কীভাবে মারা পেল সেটা শুনবেন?’

‘বল।’

‘গৱর্নের সময় হঠাতে ছুটি নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। মা’কে বললেন, একা একা থাকতে অসহ্য লাগে। তোমরা এক জ্যাপায় — আমি অন্য জ্যাপায়। উপায়ও নেই, জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের আমি কোথায় রাখব? বাঢ়াদের পড়াশোনা। মন মানে না বলে ছুটি নিয়ে চলে আসি। ভাবছি টাকা-পঞ্চা প্রতিডিনে ফাকে যা আছে তাই নিয়ে ব্যবসা করব। মা বলল, তাই কর। চাকরি যথেষ্ট হয়েছে।’

‘এই বয়সে সিরিয়াস ব্যবসা তো পারব না। টাকা-পঞ্চা যা আছে তা দিয়ে একটা ফার্মেসি দেব। তার আয়ে সংসার চলবে। কেমন হবে বল তো।’

‘ভালোই হবে।’

‘ছেলেমেয়ের জন্যেই তো সংসার। সেই ছেলেমেয়েই যদি চোখের সামনে না থাকল তাহলে সংসার করে লাভ কি?’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এবার ফিরে গিয়েই চাকরি ছাড়ার ব্যবস্থা করব। যথেষ্ট হয়েছে। আর সহ্য হচ্ছে না।’

চাকরি ছেড়ে দেবেন এই সিঙ্কান্ত নেবার পর বাবা খুব খুশি। সবইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন। মা-ও যাচ্ছেন। শুধু ভাইয়া যাবে না। জনু-জানুয়ার তার নাকি ভালো লাগে না। বাবা কত অনুরোধ করল। লাভ হল না। শেষে মুস খারাপ করে বাবা আমাদের নিয়েই গেলেন। বাঁদর দেখলেন, ময়ূর দেখলেন, হাঁচু হাঁচুতে আমাদের পায়ে ব্যথা— বাবা নির্বিকার। বিকেলে চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে আসে বাবা বললেন, ‘শাহেদা আমার শরীরটা যেন কেমন করছে।’

মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ‘কেমন করছে মানে কি?’

‘বুকতে পারছি না। কী রকম যেন লাগছে— ভোঞ্চল সিং কোঝায়?’

‘ও গেছে বন্ধুদের বাসায়। ডাক্তার ডাকতে হবে?’

‘বুঝতে পারছি না। হঠাতে প্রেসার বেড়ে গেল কিমা, সব কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। ধোয়া ধোয়া।’

‘এইসব কী বলছ?’

‘তোমর সিং কোথায়? ভোষ্টল?’

‘আপা ছুটে গেল ডাঙ্গার ডাকতে। আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম, মা কাঁদতে লাগল। বাবা শুধু একটু পর পর বলতে লাগল— ভোষ্টল কোথায়? ভোষ্টল সিং?’

‘ঠিক দু’ঘণ্টার ভেতর বাবা মারা গেলেন। আমরা হাসপাতালে নেবারও সময় পেলাম না। ভাইয়া বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর। বাসায় তখন অনেক লোকজন। ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কি? কী হয়েছে?’

‘তারপর?’

‘তারপর আবার কি? কিছু না।’

‘তোমার ভাইয়া বাবার মৃত্যু কীভাবে ঘৃণ করল?’

‘জানি না কীভাবে ঘৃণ করল। সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ফিরে এল তিন দিন পর। বাবার এর মধ্যে কবর হয়ে গেছে। ঘরে লোকজনের শিড় নেই। মা’র হার্টের অসুবিধে মতো হয়েছে— বিছানায় শোয়া। ডাঙ্গার তাঁকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খায়— ঘুমতে পারে না— বিম মেরে পড়ে থাকে।’

ভাইয়া ফিরে এসে সৎসারের হাল ধরল। তার তখন কত বয়স? বিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। চাকরি বাকরির অনেক চেষ্টা করল, পেল না। বাবার অভিজ্ঞেন্ট ফাস্ট দিয়ে বাবসার চেষ্টা করল। হেন ব্যকসা নেই যা সে করে নি। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম। মানুষ যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে আপনি ভাইয়াকে সেই সময় না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এক সময় খবর পেল এফডিসিতে মালামাল সাপ্রাইয়ের ভালো ব্যবসা আছে। ইনভেষ্টিমেন্ট কর মাত বেশি। শুরু করল সেই ব্যবসা।’

‘লাত হল?’

‘মোটাঘুটি হল। ভাইয়ার ভাগ্য ছিল খারাপ। খারাপ ভাগ্যের মানুষ তো খুব ভালো কিছু করতে পারে না।’

‘উনি মানুষ খুন করলেন কেন?’

‘সেটা আমি আপনাকে বলব না। সব কথা বলতে নেই। কিছু কিছু কথা না বলাই ভালো। হয়েছে কী জানেন? ভাইয়া তো গভীর রাতে ফেরে, সেদিন হঠাত দুপুরে এসে হাজির। আমাকে বলল, খুকি চিড়িয়াখানায় যাবিঃ ভাইয়া আমাকে বুমুর ডাকতুম, ডাকত খুকি। ভাইয়া আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চায় শুনে আমি অবাক রহমান না। কারণ আমি জানতাম বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়া প্রায়ই চিড়িয়াখানায় যায়। হাটেরের খাঁচার সমনে চাঢ়িয়ে থাকে। আমি বললাম, হ্যাঁ ভাইয়া যাব। আমি কাপড় মের তেরি হয়েছি। ভাইয়া বলল — না থাক। তখন আমরা মগবাজারের একটা বাস্তি থাকতাম। ছোট একতলা বাসার একদিকে আমরা অন্যদিকে শাফিজ সাহেব স্কুল এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে। সেদিন ভাইয়া সেই যে দুপুরে এসেছে আর বেরছে না। সন্ধ্যাবেলায় মা বললেন— কি রে তোর কি শরীরটা খারাপ?’

ভাইয়া বলল, ইঁ।

জুন্ন টুর নাকি রে দেখি কাছে আয় তো ।

ভাইয়া বলল, দেখতে হবে না। জুন্ন টুর কিছু হয় নি। রাতে ভাইয়া তাত খেল না। ম' টার সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সে বাইরের ঘরে ঘুমাল। আমি গিয়ে দেখি মশা ডন্ডন করছে— এর মধ্যেই ভাইয়া ঘুমাচ্ছে। আমি মশারি থাটিয়ে দিলাম। ভাইয়া রাত বারটার দিকে জেগে উঠল। নিজেই রান্নাঘরে চুকে চাবের কেতলি বসাল। পটখট শব্দ শুনে মা জেগেছে। রান্নাঘরে চুকে অবাক হয়ে বলল, তুই এখানে কী করছিস? ভাইয়া হাসিমুখে বলল, চা বানাচ্ছি। তুমি বাবে মা? মা বলল, না। ভাইয়া বলল, খাও না। দেখ আমি কী সুন্দর চা বানাই? ভাইয়া চা বানাল। মা'কে নিয়ে দু'জনে মিলে চা খেল। তার কিছুক্ষণ পর দরজার কলিংবেল বাজতে লাগল। মা বললেন, কে? পাশের ঘরের হাফিজ সাহেব বললেন, খালাসা দরজা খুলুন পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

মা হতভব হয়ে দরজা খুললেন। আমি তখন জেগেছি, আপা জেগেছে। আমরা বুঝতেই পারছি না কী হচ্ছে। আমরা দেখলাম, অনেকস্থলো পুলিশ বাড়িতে ঢুকল। তো বিহানা, বাণিশ, খাট মিটসেফ উলট-পালট করতে লাগল। আপা তবে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভাইয়া কী ব্যাপার? ভাইয়া জবাব দিল না। একজন পুলিশ অফিসার বললেন, তারের কিছু নেই। রুটিন চেক। আমরা এক্সুনি চলে যাব।

তারা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেল, তবে যাবার সময় ভাইয়াকে নিয়ে গেল। আপা বললেন, ভাইয়াকে কেথায় নিছেন? পুলিশ অফিসার বললেন, থানায় দু'একটা প্রশ্ন ট্রিশ জিজেস করে ছেড়ে দেব। আজ রাতেই ছেড়ে দেব। তারের কিছু নেই।

পুলিশ ভাইয়াকে ছাড়ল না। এই যে ভাইয়া গেল আর বাসায় ফিরল না। পরদিন তোরবেলা আপা আমাকে নিয়ে থানায় গেছে। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হল হাজতে। ভাইয়া আপার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। বাসায় চলে যা। আমি একটা খুন করেছি। পুলিশের কাছে স্বীকার করেছি।

‘বুমুর! ’

বুমুর পেছন ফিরল। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে বিশয় ও তর। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘কার সঙ্গে কথা বলছিস?’

বুমুর বলল, ‘কারো সঙ্গে না। নিজের মনে কথা বলছি। ’

‘আয় বুমুতে আয়! ’

বুমুর বলল, ‘আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকব। ’

‘দুপূরবাতে একা একা বারান্দায় বসে থাকবি এটা কেমন কথা?’

‘আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে মা। ’

‘আয় লক্ষ্মীসেনা ঘরে আয়। ’

শাহেদা বারান্দায় এসে বুমুরের হাত ধরলেন। বুমুর আপত্তি করল না, উঠে এল। শাহেদা বললেন, ‘রাতে তো কিছু খাস নি। খিদে হয়েছে, কিছু খাবি? একটা পরোটা তেজে দেব?’

‘দাও, তোমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে মা?’

শাহেদা জবাব দিলেন না। রান্নাঘরে ঢুকলেন। পরোটা বানানো গেল না। ময়দা শেষ হয়ে গেছে তিনি ভুলে গেছেন। ময়দার কথা মিঝুকে বলা হয়েছে— তোরবেলা সে নিয়ে আসবে।

শাহেদা বললেন, ‘চারটা চাল ফুটিয়ে দিই?’

বুমুর বলল, ‘কোনো কিছু ফুটিয়ে দিতে হবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ে না। এক প্লাস শরবত খেতে পারি। ঘরে কি চিনি আছে মা?’

শাহেদা দেখলেন চিনির কেটাও থালি। বুমুর বলল, ‘একেকটা দিন খুব অসুস্থ হয়। কিছুই পাওয়া যায় না। আবার কোনো কোনো দিন আছে— সব পাওয়া যায়। সে দিন তুমি যা চাইবে তাই পাবে।’

শাহেদা শস্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বুমুর। মেয়েটাকে আজ অনেক বড় বড় মাগছে। বুমুর বলল, ‘মা শোন আপার একটা কথা তোমাকে বলি— আপাকে নিয়ে মাঝে মাঝে তুমি দুশ্চিন্তা কর। আজেবাজে কথা ভাব। এইসব ভাবার কোনো কারণ নেই। আপা মরে যাবে তবুও অন্যায় কিছু করবে না।’

শাহেদা চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুমুর বলল, ‘সিনেমার কাজ, শৃঙ্খিলের কাজ— রাত দিন বাইরে থাকতে হয় বলে লোকজন আজেবাজে কথা বলে। তাদের আজেবাজে কথা বলার কোনো কারণ নেই।’

শাহেদা কাঁপা গলায় বললেন, ‘সেইটাই তো আমি বলি মা। আমার নিজের মেয়ে আমি তাকে জানি না।’

‘লোকজনের আজেবাজে কথা বলার কোনো অধিকারও নেই। আপা কি সামান্য চাকরির জন্যে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যায় নি? কেউ কি দিয়েছে তাকে কিছু জোগাড় করে? আজ কেন বড় বড় কথা বলে?’

শাহেদা চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন — ‘তুই যে বললি ও রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁদে। কাঁদে কেন?’

‘মনের দুঃখে কাঁদে। আমার মনে হয় বেশিরভাগ সময় মবিন ভাইয়ের জন্যে কাঁদে। প্রায়ই তো মবিন ভাইয়ের টিউশ্যানি চলে যায়। বেচারার প্রায় না খেয়ে থাকার মতো জোগাড় হয়। একবার কী হয়েছে জান মা? প্রায় দশ দিন মবিন ভাই ভাত খায় নি। যে হোটেলে বাকিতে যেত তারা খাওয়া বক করে দিয়েছে ...’

‘থাক এসব শুনতে চাচ্ছি না।’

‘শোন না মা — মবিন ভাই বাধ্য হয়ে চিড়া আর শুড় কিনে আনল। চিড়া পানিতে ভিজিয়ে শুড় দিয়ে থায়। আপা জানতে পেরে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে এসে খুব কাঁদছিল।’

শাহেদা দীর্ঘনিশ্চাস ফেললেন। বুমুর এসে মাঘের পাশে যস্তে। কোমল গলায় বলল, ‘তুমি মবিন ভাইয়ের সঙ্গে আপার বিয়ে দাও মা। ওরা কয়েকটা দিন আনন্দ করুক।’

‘ও বউকে থাওয়াবে কী?’

‘চিড়া আর শুড় থাওয়াবে। তাতে কি মা? ওরা দুজন যখন বারান্দায় বসে গল করবে তখন দেখ তোমার কত ভালো মাগবে।’

শাহেদা দেখলেন বুমুরের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।



আজমল তরফদারের ছবি ‘প্রেম দেওয়ানা’র ডাবিং শুরু হয়েছে। ডাবিং স্টুডিওতে জমজমাট অবস্থা। ন’টা থেকে শিফট শুরু হলেও স্টার সুপারস্টারো দশটা—এগারটার দিকে আসেন। যিনি যত বড় স্টার তিনি আসবেন তত দেরিতে। গ্যালাক্সি স্টার ফরহাদের সেই হিসেবে বারটার দিকে আসার কথা। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় তিনি সকাল ন’টার সময় চলে এসেছেন। তাঁর মুডও আজ খুব ভালো। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে বললেন, ‘আজমল ভাই ঝম্পেশ করে চা বানান দেখি। আপনার ব্যাটেলিয়ান রেডি?’

‘হ্যাঁ রেডি।’

‘দেখবেন ইম্পাক্ট চল্লিশ মুগ এক শিফটে মাঝিয়ে দেব। ম্যাডাম এসেছেন?’

‘এখনো আসেন নি।’

‘ডায়ালগ দিতে বলুন। বসে বসে মুখস্থ করতে থাকি। চা তো এখনো দিল না—ফ্রের-বয়...’

ফরহাদ সাহেবের ডাবিং ক্লায়ে ঢুকে গেলেন।

আজমল তরফদারের সঙ্গে বিমল দাঁড়িয়ে আছে। সে এসেছে বিশেষ কারণে, রেশমাকে বড় সাহেবের অফিসে নিয়ে যেতে হবে। বড় সাহেবে ষ্বর পাঠিয়েছেন। ‘রেশমা’র আজ ডাবিং আছে। সে ন’টার আগেই এসে পড়ে। আজই শুধু দেরি হচ্ছে।

বিমল ফরহাদকে দেখিয়ে নিচু গলায় বলল, ‘উনি কি আপনার ছবির হিরো?’

‘হ্যাঁ। যা তা হিরো না গ্যালাক্সি হিট হিরো।’

‘আমাদের ছবিতে কি উনি থাকছেন?’

‘হ্যাঁ। না থাকলেই ভালো হত।’

‘কেন?’

‘গাধা। অভিনয় জানে না।’

‘তাহলে তাকে নিচ্ছেন কেন?’

‘রিকশাওয়ানারা তাকে দেখতে চায়।’

‘তাকে কি নতুন ছবির কথা বলা হয়েছে?’

BanglaBook.org

‘এখনো বলা হয় নি, তবে সে জেনে গেছে যে আমরা বড় বাজেটে নামহি। ছবি পাড়ায় খবর হয়ে গেছে। আজ যে ন’টার সময় উপস্থিত—এই কারণেই উপস্থিত।’

‘আপনাকে খাতির করা শুরু করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

লুপ লাগানো হয়েছে। খও খও দৃশ্য বড় পর্দায় দেখানো হচ্ছে। ছবি দেখে দেখে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ডায়ালগ বলবেন, ম্যাগনেটিক ফিল্ম সেই শব্দ ধরা হবে। পরে একসঙ্গে জোড়া লাগানো হবে।

বিমল বলল, ‘ব্যাপারটা তো খুব ইন্টারেষ্টিং।’

‘কাগজে—কলমে খুব ইন্টারেষ্টিং তবে কাজ শুরু হলে দেখবে কত ঘামেলা। ঠোট মেলানো যায় না। ডায়ালগ যায় একদিকে ঠোট নড়ে অন্যদিকে।’

‘কাজ শুরু হবে কখন?’

‘ম্যাডাম এলেই শুরু হবে।’

ফরহাদ সাহেব চায়ের কাপ এবং হাতে ক্রিট নিয়ে আজমল তরফদারের কাছে ঢলে এলেন।

‘কাজ শুরু হবে কখন আজমল ভাই?’

‘এই তো অল্প কিছুক্ষণ।’

‘আপনার সঙ্গে বসে গল্পজুড়ি করি? মতুন বই নাকি করছেন? বিগ বাজেট মুড়ি।’

‘হ্যাঁ।’

‘স্টোরি লেখা হয়েছে?’

‘হচ্ছে।’

‘নায়ক—নায়িকা কয় পেমার? শ্বান ওব টু?’

‘এখনো কিছুই ঠিক হয় নি।’

‘আর্টিষ্টের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?’

‘এখনো ভাবি নি।’

‘আমার অবশ্য দম ফেলার সময় নেই। হেভি বুকিং। তারপরেও আপনার ব্যাপার অন্য।’

‘থ্যাঙ্ক যু।’

‘আপনার ‘শ্রেষ্ঠ দেওয়ানা’ও হিট করবে। ডায়ালগ মারাত্মক হিট ডায়ালগ। ডায়ালগের জন্যে উচ্চ যাবে...’

কথাবর্তার এই পর্যায়ে ডাবিং স্টুডিওর দরজা ফাঁক করে রেশমা তাকাল। আজমল তরফদার ফরহাদ সাহেবের কথা সম্পূর্ণ অঁগাহা করে বললেন। রেশমা এস এস।’

রেশমা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আজমল তরফদার এরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে ভাকবেন ভাবাই যায় না। সে দেরি করে এসেছে বলেই কি রমিকতা করছেন? এখনই কৃত্সিত গালি শুরু হবে? হলভর্টি মানুষের সামনে গালি শুনতে এত খারাপ লাগে। তার হাত-পা জমে যাবার মতো হল।

‘দাঁড়িয়ে আছ কেন, আস? পরিচয় করিয়ে দিই— এ হল বিমল। বিমলচন্দ্ৰ হাঙোদাৰ। বিমল এৰ নাম রেশমা।’

বিমল তড়াক কৱে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিনীতভাবে সে সালাম দিল। ফৱহাদ পৰ্যন্ত অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

রেশমা ইত্তেজ কৱে বলল, ‘বাসেৰ চাকা পাঞ্চার হয়ে গিযেছিল। ঠিক কৱল এই জন্যে দেৱি হয়েছে।’

আজমল তৱফদাৰ বললেন, ‘নো প্ৰবলেম। এগাৰটাৰ আগে ডাবিং শুল্ক হবে না। তোমাৰ বোধহয় দু'টা লুপ। এক সময় কৱে ফেললেই হবে। বিমল তোমাকে নিতে এসেছে ওৱ সঙ্গে একটু যাও।’

কোথায় যেতে হবে, কী ব্যাপার এইসব কিছুই জিজ্ঞেস কৱতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রেশমা’ৰ মনে হল সে পালিয়ে যেতে পাৱলে বাঁচে।

আজমল তৱফদাৰ বললেন, ‘রেশমা তুমি কি চা খেয়ে যেতে চাও? চা হয়ে গেছে। এক কাপ চা খেয়ে যাও।’

ডাইরেক্ট সাহেবেৰ জন্যে আলাদা সুন্দৰ কাপে চা আসে। আজমল তৱফদাৰ নিষ্জেই তাঁৰ চায়েৰ কাপ ধৰিয়ে ধৰলেন।

রেশমা ক্ষীণ গলায় বলল, ‘চা খাৰ না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কিৱে এসে চা খেয়ো, এখন বৰং বিমলেৰ সঙ্গে চলে যাও।’

ডাবিং স্টুডিওৰ সামনে কালো বাঞ্জেৰ বিৱাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িৰ জানালাৰ কাচে পৰ্দা দেয়া। বিমল এসে গাড়িৰ দৱজা খুলে দিল। আশপাশেৰ লোকজন কৌতুহলী চোখে তাকে দেখছে। তাৰচেয়েও বড় কথা আজমল তৱফদাৰ তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন।

মোৰাবক সাহেবেৰ চোখে বিড়িং গ্লাস। অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি চশমা। এই চশমাৰ অসুবিধা এই যে, যাৰ দিকে তাকালো হয় সে চোখ দেখতে পায়। তিনি কাউকে তাঁৰ চোখ দেখাতে চান না। তাঁৰ ধাৰণা শ্ৰীৱেৰ যেমন পোশাকেৰ থমোজন, চোখেৰ তেমন পোশাক দৱকাৰ। নথু চোখ নথু শ্ৰীৱেৰ মতো।

মোৰাবক সাহেবেৰ চোখে বিড়িং গ্লাস। এই চশমাৰ অসুবিধা এই যে, যাৰ দিকে তাকালো হয় সে চোখ দেখতে পায়। তিনি কাউকে তাঁৰ চোখ দেখাতে চান না। তাঁৰ ধাৰণা শ্ৰীৱেৰ যেমন পোশাকেৰ থমোজন, চোখেৰ তেমন পোশাক দৱকাৰ। নথু চোখ নথু শ্ৰীৱেৰ মতো।

মোৰাবক বসল। ঘড়োসড়ো হয়ে বসল। মেয়েটিকে তিনি আগে একবার দেখেছেন। সে দেখা বাতেৰ দেখা। দিনে কৰনো দেখেন নি। এখন বকবকে দিল্লি ঘাড়তে বাজছে বারটা একুশ। বাতেৰ দেখা মানুষ দিনেৰ আলোয় সম্পূৰ্ণ অমৃতকম হয়ে যায়। এই মেয়েটাৰ ক্ষেত্ৰে সে রকম ঘটে কিনা তাঁৰ জানাৰ ইচ্ছা।

মেয়েটি সাজগোজ কৱে নি। এ বাতে বেশ সেজেছিল। কপালে টিপ ছিল। ঠোঁটে লিপষ্টিক ছিল। আজ কপাল শূন্য, ঠোঁটেও লিপষ্টিক নেই। মেয়েটি কোলেৰ উপৰ হাত রেখে বসেছে বলে তিনি তাৰ হাত দেখতে পাইছেন না। এ বাতে মেয়েটিৰ হাতে সবুজ বাঞ্জেৰ কাচেৰ চুড়ি ছিল। আজ বোধহয় চুড়ি পৱে নি। চুড়ি পৱলে চুড়িৰ টুট্টাং আওয়াজ

কানে আসত :

‘তোমার নাম টেপী তাই তো?’

রেশমা জবাব দিল না। চূঁপ করে বসে রইল। মোবারক সাহেব চোখ থেকে বিড়িং
গ্লাস পুরোপুরি খুলে ফেললেন। তাঁর যে শব্দ কাছে দেখার সমস্যা তাই না— মাঝেপিয়া
আছে বলে দূরের জিনিসও তালো দেখতে পান না। মেয়েটিকে তালোমতো দেখার জন্যে
অন্য একটা চশমা দরকার। তিনি দুয়ার খুললেন। চশমা বের করে পরলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
তাকালেন।

‘ঐ দিন তুমি মিথ্যা করে কেন বললে তোমার নাম টেপী, বোনের নাম হ্যাপী। মিথ্যা
বশার প্রয়োজন ছিল কি?’

‘ছিল।’

‘আসল নাম, পরিচয় কাউকে আনতে দিতে চাও না, এই তো ব্যাপার?’

‘ছিল।’

‘যে তোমার সত্ত্বিকার পরিচয় বের করতে চায় তার জন্যে তো খুব সমস্যা হবার
কথা না।’

‘কেউ সত্ত্বিকার পরিচয় বের করতে চায় না।’

‘তুমি চা বা কফি খাবে?’

‘ছিল না।’

‘তুমি সিনেমার লাইনে, সেখান থেকে নতুন পেশায় কীভাবে চলে এলে?’

‘আমি বলতে চাছি না।’

‘বলতে চাছ না কেন?’

‘বলতে ইচ্ছা করছে না। গল্প করব মতো মঞ্চার কোনো বিষয় এটা না।’

‘আমি তো গল্প করছি না। জানতে চাছি।’

‘জানতে চাচ্ছেন কেন?’

‘কৌতৃহল বলতে পার। তোমার এক তাই তো জেলে আছে। ও জেলে গেল কেন?’

‘ও জেলে আছে সেটা যখন জানেন তখন জেলে কেন সেটাও জানা আপনার অনে
কোনো সমস্যা না।’

‘তুমি বলতে চাছ না?’

‘ছিল না।’

মোবারক সাহেব ইটারকমের বোতাম টিপে দু’ গ্লাস পানি দিয়ে যেতে বললেন।
পানি সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। তিনি নিজে এক গ্লাস পানি নিলেন। বেগমার দিকে একটা গ্লাস
বাঢ়িয়ে দিলেন।

‘নাও পানি খাও।’

‘আমার তৃক্ষণ পায় নি আমি পানি খাব না।’

‘ঐ রাতে তুমি তো বেশ হাসিখুশি ছিলে— গল্প করছিলে, আজ এমন গঞ্জীর হয়ে আছ
কেন?’

‘ঐ রাতে আপনি আমাকে কী জন্যে ডেকে এনেছিলেন আমি জানতাম। আজ কী জন্যে এনেছেন আমি জানি না।’

‘তোমাকে কী জন্যে আনা হয়েছে তুমি জ্ঞান না?’

‘কিন্তু না।’

‘অনুমান করতে পারছ? না তাও পারছ না?’

‘পারছি না।’

‘ঐ দিন তোমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। টাকা ফেলে চলে গেলে কেন?’

‘রাগ হয়েছিল। ঐ জন্যে ফেলে চলে গেছি।’

‘তুমি যে জীবনযাপন করছ সে জীবনে কি টাকার উপর রাগ করা মানায়?’

‘না মানায় না। আপনার টাকা আমি নিয়েছি। সংসারে খবচ করেছি।’

‘তুমি তোমার একটা চুলের ফিতাও ফেলে রেখে গিয়েছিলে।’

রেশমা চোখ তুলে ভাকাল। লোকটির কাগাকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। এই লোক তার কাছে কী চায়? খারাপ মেয়েদের নিয়ে নানান ধরনের মজা করতে লোকজন ভালবাসে। এও কি মজা করছে লোকটা জানে না যে ইচ্ছে করলেই রেশমাও লোকটাকে নিয়ে মজা করতে পারে। না রেশমা পারে না। টেপী পারে। টেপী নানান ধরনের মজা করে। কিন্তু এখন সে টেপী না, সে এখন রেশমা। রেশমা মোটমুটিভাবে ভদ্র মেয়ে। আর মিতু কেমন মেয়ে? এই ভদ্রলোক জানেন না মিতু কেমন মেয়ে। শুধু মবিন ভাই জানেন।

এই লোকটার সামনে সে কি কিছুক্ষণের জন্যে মিতু হবে? লোকটা ভাকে চমকে দেয়ার চেষ্টা করছে। নানান ধরনের চশমা পরে, নানানভাবে তাকাচ্ছে। চুলের ফিতার অসঙ্গ তুলেছে — তার মানে চুলের ফিতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রেশমা সহজ হয়ে বসল। মিটি করে হাসল, একটু বুঁকে এসে বলল, ‘আপনি কি আমার চুলের ফিতা নিয়ে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

চুলের ফিতা ফেরত দেবার দরকার ছিল না। চুলের ফিতা আমি ইচ্ছা করে রেখে এসেছিলাম।

‘কেন?’

‘উপহার। একটা খারাপ মেয়েরও তো উপহার দেবার ইচ্ছা হতে পারে। পান্তে না?’

‘হ্যাঁ পারে। কাজেই তুমি বগতে চাছ যে আমি ঐ ফিতা রেখে দিতে পারিব়?’

‘হ্যাঁ। পারেন।’

‘তুমি কথা তো খুব শুচিয়ে বলছ।’

‘নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশি। নানান রকমের কথা মলা শিখি।’

‘আমার সঙ্গে তো বেশ কিছু সময় ছিলে। আমার জন্ম থেকে কী শিখেছে?’

‘আপনার কাছ থেকে শিখেছি মানুষকে কৌকরে তয় দেখাতে হয়। আপনার কর্মচারীরা নিশ্চয়ই আপনাকে অসম্ভব তয় পায়।’

‘হ্যাঁ পায়।’

‘আপনার হ্রীও খুব ভয় পান তাই না?’

‘মনে হয় পায়। সে রাতে তুমি তয় পেয়েছিলে, এখন তো মনে হয় পাঞ্চ না।’

‘না এখন পাঞ্চ না।’

‘পাঞ্চ না কেন?’

‘আমার যা মনে আসছে সেটা যদি বলে ফেলি আপনি রাগ করবেন না তো?’

‘বল, রাগ করব না।’

‘আপনাকে ভয় পাওয়ার মতো প্রচুর লোকজন আপনি চারদিকে জড়ো করে রেখেছেন, কিন্তু আপনার কথা বলার লোক নেই। যে অন্যে আপনার লোকজন আমার মতো মেয়েদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসে।’

‘আমার সঙ্গে খালিকক্ষণ থেকে তোমার এই ধারণা হয়েছে?’

‘জ্ঞি। অনেকের সঙ্গে ঘিশেছি তো। মানুষের অনেক কিন্তু চট করে ধরে ফেলতে পারি।’

‘তোমার জীবনের পরিকল্পনা কি?’

‘কোনো পরিকল্পনা নেই।’

‘সে কী! কোনো পরিকল্পনা নেই?’

‘না।’

‘বিয়ে করে সৎসারী হবার পরিকল্পনাও নেই?’

রেশমা চূপ করে রইল। মোবারক সাহেব আগ্রহ নিয়ে ঝিঞ্জেস করলেন, ‘ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত আছ। তোমার কি ইচ্ছে করে না কোনো একটা ছবির নায়িকা হবে? সুপারস্টার হবে? ইচ্ছে করে?’

‘রেশমার খুব ইচ্ছা করে। মিতুর করে না।’

‘বুবাতে পারছি না।’

‘বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মিতু। আমার ছবির নাম রেশমা। আর রাতে যখন আপনাদের মতো মানুষদের কাছে যাই তখন আমি টেপী।’

‘তোমাকে আমি কোন নামে ডাকব?’

‘টেপী নামে ডাকবেন। টেপী নামটা খুব খারাপ লাগলে রেশমা ডাকবেন।’

‘মিতু ডাকা যাবে না?’

‘না আপনি টেপীকে চেনেন। মিতুকে চেনেন না।’

‘চা খাবে?’

‘না।’

‘খাও, চা খাও।’

মোবারক সাহেব ইন্টারকমে চা দিতে বললেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। বেশিক্ষণ তিনি চোখে চশমা রাখতে পারেন না। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। তিনি চোখের ডাঙ্কারের সঙ্গে কথা বললেন।

ডাঙ্কারের ধারণা— চশমার জন্যে চোখে যন্ত্রণা হবার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এক ফাঁকে কথা বলতে হবে।

মোবারক সাহেব চশমা ঢুঁয়াও রাখলেন। সেখান থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। এটি দিনের প্রথম সিগারেট। অর্থম সিগারেট যেতে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়টি ভালো লাগে। তিনি ঠিক করে ফেললেন, যেয়েটি থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরাবেন। কফির সঙ্গে সিগারেট— ভালো লাগবে। মোবারক সাহেব খানিকটা খুকে এসে বললেন, ‘তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাকে চমৎকার কোনো শিফট আমি দিতে চাই। কী শিফট পেলে তুমি খুশি হবে বল?’

‘যা চাই তাই দেবেন?’

‘দিয়ে ফেলতেও পারি। পরীক্ষা করে দেখ।’

বেশমা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমি কারো কাছ থেকে শিফট নেই না।’

‘তুমি তো ঠিক কথা বললে না চেপো। তুমিও শিফট নাও। যবিন বলে এক ভদ্রলোক তোমাকে শিফট দেন না?’

বেশমা বিশ্বিত হয়ে বলল, ‘আপনি সব খবর জানেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘পরে এক সময় বলা ধাবে।’

‘আজ বলবেন না?’

‘না। একটা বেজে গেছে। একটার সময় আমার অন্য আপয়েন্টমেন্ট।’

‘স্যার আমি যাই?’

‘আচ্ছা ধাও। কোথায় যাবে নিচে গিয়ে বল গাড়ি তোমাকে পৌছে দেবে।’

‘গাড়ি শাগবে না।’

মোবারক সাহেব সাধারণত আধকাপের বেশি কফি খান না। আজ পুরোকাপ শেষ করলেন। কয়েকটা জরুরি টেলিফোন কল সাবলেন। তবে কোথাও খুব মন বসাতে পারলেন না। ইনকামট্যাঙ্ক লাইয়ারকে এগারটায় আসতে বলেছিলেন। সে এসেছে, নিচে অপেক্ষা করছে— তার সঙ্গে বসতে ইচ্ছা করছে না। তাকে চলে যেতে বলতেও ঘন সায় দিছে না। অস্থির ভাবটা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে— ইনকামট্যাঙ্ক লাইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। সে চলে গেলে হয় কী করে। অপেক্ষা করুক। টেবিলের উপর সেক্রেটারির হাতে লেখা নোট পড়ে আছে। তাকে ঘনে করিয়ে দেবার জন্যে নোটগুলো লেখা। দুটা পয়েন্টে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

১. শিক্ষামন্ত্রী আফসারউদ্দিন থাঁ দু'বার টেলিফোন করেছেন। তিনি মুঠা পর্যন্ত দণ্ডের আছেন।

২. গুলশান থেকে আশা টেলিফোন করেছেন। খুব জরুরি ঘৰে আছে।

৩. চেম্বার অফ কমার্সের মিটিং সোনারগাঁ হোটেলের রুমক্স— সন্ধ্যা ৭টায়।

৪. বিথোভেনের শ্রবণে জার্মান দৃতাবাসে কক্টেল প্রাইট— সন্ধ্যা ৭টায়।

এক এবং তিন নম্বর আইটেমে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

দু' নম্বর আইটেমে মোটেই জরুরি নয় তারপরেও মোবারক সাহেব পিএকে বললেন তার স্ত্রীকে লাইনে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

‘হালো রেহানা! জরুরি কী খবর যেন দেবে বলেছিলে।’

‘তোমাকে তো টেলিফোন করে করে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। কথনোই লাইন দেয় না। তোমার সেক্রেটারির দল কি ইচ্ছা করে আমাকে এভয়েড করে?’

‘ওদের দোষ নেই — মিটিংঙে ছিলাম। জরুরি খবরটা কী বল?’

‘তুমি যে স্পন্দনার দু'টা বই এনেছ, দু'টা বই সম্পূর্ণ দু'রকম। একটাতে লেখা হাতি স্পন্দনে দেখলে ধন লাভ হয়। আরেকটায় লেখা হাতি স্পন্দনে দেখা বিপদের পূর্বাভাস। সম্পূর্ণ উট্টা না?’

‘তা তো বটেই।’

‘এখন আমি কোনটা বিশ্বাস করব?’

‘যেটা ভালো সেটা বিশ্বাস করাই তো নিরাপদ। তুমি কি হাতি স্পন্দনে দেখেছ?’

‘না।’

‘তাহলে হাতি দেখা নিয়ে মাথা ঘামাছ কেন?’

‘একটা বইয়ের সঙ্গে অন্যটা মিলিয়ে দেখছি— কিছু করার নেই তো ... যতই ধাঁটছি ততই অবাক হচ্ছি। অবশ্যি কিছু কিছু জায়গায় দু'টা বইয়ের একই অর্থ, যেমন ধর— পানি স্পন্দনে দেখলে অসুবিধা বিসুখ হবে।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমি করছি কি যে সব স্পন্দনের অর্থ দু'টা বইয়ে একই লেখা সেগুলো সবুজ কালি দিয়ে দাগাছি।’

‘দাগাদাগির কাজ তো সাধারণত লাল কালি দিয়ে করা হয়, তুমি সবুজ কালি ব্যবহার করছ কেন?’

‘আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও এক সেকেন্ড খুব একটা জরুরি কথা, পরে বলতে তুলে যাব — সিমির যমজ মেয়ে হয়েছে। আমি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম— খুব সুন্দর হয়েছে।’

সিমিকে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না, তারপরেও যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, ‘সিমি ভালো আছে তো?’

‘হ্যাঁ ভালো। যমজ মেয়ে দেখে একটু মন খারাপ করেছে।’

‘মন খারাপের কী আছে?’

‘আগে আরো দু'টা মেয়ে আছে এই জন্যে একটু মন খারাপ।’

‘ও আচ্ছা, আগেরও তো দু'টা মেয়ে আছে — তুলে গিয়েছিলাম। রেহানা শোন, একটু পরে তোমাকে আবার টেলিফোন করব। ইনকামটাসের এক উকিল এসেছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।’

মোবারক সাহেব রেহানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল্লান না। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লাল কালি দিয়ে তাঁর সামনে রাখা নোটের দু'পাশে ওইটেম কেটে দিলেন। পিএকে বললেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিবে দিতে।

শিক্ষামন্ত্রী আফসারটদিন থাঁ অত্যন্ত আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, ‘মোবারক সাহেব নাকি? আরে ভাই আপনাকে তো পীওয়াই যায় না।’

‘বুবই ব্যক্তিগত ভেতর আছ স্যার।’

‘ব্যক্তি মানুষ ব্যক্তি থাকবে না? তাই বলে একেবাবে যোগাযোগ বাদ দিবেন এটা কেমন কথা।’

‘এই তো স্যার যোগাযোগ করলাম — এখন বশুন কী খেদমত করতে পারি।’

‘খেদমত আপনি কী করবেন? খেদমত করব আমরা। আমরা হলাম জনগণের খেদমতগ্রাহ।’

‘পরিবকে শ্বরণ করেছেন কী জন্যে স্যার বশুন।’

‘আমার মেজ মেঘের বিমে।’

‘বাহু বাহু বুব তালো সংবাদ।’

‘তালো সংবাদ মন সংবাদ জানি না। মেঘে বখন আছে পার তো করতে হবে — আপনার ছেলেপুলে নাই — ঝাড়া হাত-পা মানুষ, ছেলেপুলের বিয়েশাদীর ফল্পণা আপনাকে পোহাতে হচ্ছে না। You are a lucky man.’

‘মেঘের বিমে উপলক্ষে যদি আপনার কোনো কাজে জাপি বলতে লজ্জা করবেন না।’

‘আবে লজ্জা করব কেন? আপনি তো বাইরের কেউ না। আপনার ভাবি কাল রাতেও বলেছে — মোবারক সাহেবকে কিন্তু টেলিফোনে দাওয়াত দেবে না। নিজে শিখে দাওয়াত দেবে।’

‘আপনি কিন্তু স্যার ভাবির কথা শোনেন নি, টেলিফোনে দাওয়াত সেবেছেন।’

‘আবে ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন! বিস্তার খবরটা ইন অ্যাডভাস আপনাকে দিলাম — দাওয়াতের তো কার্ডই ছাপা হয় নি।’

‘সার ব্যাট ব্যবেং

‘এখনো দেরি আছে। ২৫ তারিখ অক্টোবর, সেনাকুঞ্জে।’

‘আপনার মেয়েকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন সে চাচার কাছ থেকে কী উপহার চায়। নাকি আমি নিজেই জিজ্ঞেস করব?’

‘সর্বনাশ ঐ কাজ করতে যাবেন না। সে গাঢ়ি চেয়ে বসবে। ঐ দিন সে তার মা’কে বলছিল মোবারক চাচার অভ্যাস উপহার দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করা কী উপহার চাই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলব — লাল রঙের টয়োটা সিতাম।’

‘লাল রঙের টয়োটা সিতানের শব্দ?’

‘আবে ভাই ছিঃ ছিঃ আমার এই গাপগী মেঘের কথার কোনো স্ফুল্প দেখেন নো। যদি কিছু দিতে হয় একটা কোরান শরিফ দেবেন। মোবারক সাহেব।’

‘কী।’

‘মেঘের লাল গাঢ়ির শব্দের কথা আপনাকে কলা উচিত হয় নি। আপনি তো আবার ছেলেমেয়ের শব্দের অত্যধিক স্ফুল্প দেন — তাই তনুন আমি নিজের ব্যক্তিগত ধারণা — আগ্নাহপাকের পাক কালামের চেয়ে তালো গিফট। কিন্তু কিন্তুই হয় না। এখন এর কারণে আপনারা আমাকে প্রাচীনপন্থী মনে করেন বা না করেন — কিন্তু যায় আসে না ...’

আফসারউদ্দিন বাঁ সাহেবও রেহানার মতো দীর্ঘ সময় কথা বললেন। মোবারক সাহেব ছাড়া গেলেন আধুন্টা গুর। পিএকে বললেন — নোট করে রাখুন মন্ত্রী

আফসারউদ্দিনের মেয়ের বিয়ে ২৫ তারিখ। সেনাকুঞ্জে। বিয়ের টাইমটা জেনে নেবেন।
গিফ্ট আইটেম— একটা কোরান শরিফ সুন্দর করে রায়পাং পেপারে মোড়া।

‘কোরান শরিফ?’

‘হ্যাঁ।’

মোবারক সাহেব মনে মনে হাসলেন। মন্ত্রী আফসারউদ্দিনের সঙ্গে এই বসিকতা করা যায়। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে লাল রঙের টয়োটা সিভান আসছে। সে জানে না এই জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে নেয়া ঠিক না। জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।



ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে চিঠি এসেছে। রফিক লিখছে— সে হসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার শরীর খারাপ। মা যেন একবার তাকে দেখতে যায়।

শাহেদাকে সেই চিঠি দেখানো হয়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ঝুমুর বলল, ‘তুমি কি দেখতে যাবে?’ শাহেদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছেন। সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন নি। ঝুমুর বলল, ‘তুমি যদি যেতে চাও, আগাকে বলতে হবে। দেখা করতে চাইলেই তো দেখা হয় না। ঘুষ-টুস খাওয়াতে হয়। আগে থেকে না জানালে আপা ব্যবস্থা করবে কীভাবে?’ শাহেদা তারপরেও জবাব দিলেন না। ঝুমুর বলল, ‘তুমি কি আপার সঙ্গে কথা বলবে? আপা থারেই আছে। আজ সে কোথাও যাবে না।’

‘তুই স্কুলে যা। তোকে এত কথা বলতে হবে না।’

‘আমি আজ স্কুলে যাব না। আপার সঙ্গে সারাদিন গল্প করব।’

‘কর যা ইচ্ছা।’

মিতু দৱজ্ঞা ভিজিয়ে শুয়ে আছে। ছোট বোনের সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে তার তেমন অংশহ দেখা যাচ্ছে না। ঝুমুর কয়েকবার কাছে গেল, বিছানার পাশে বসল। মিতু তাকিয়ে দেখল— কিছু বলল না।

‘আপা মাথা বিলি দিয়ে দেব?’

মিতু না-সূচক মাথা নাড়ল।

‘শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?’

‘শরীর খারাপ লাগছে না। শরীর ভালোই, আরাম করছি। বিকৃত পর্যন্ত শুয়ে থাকব।’

‘তারপর?’

‘বিকেলে বেরব।’

ঝুমুর আপার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে শিয়ে বলল, ‘রাতে শ্যাটিং আছে?’

‘হঁ।’

‘সারারাত শ্যাটিং চলবে?’

মিতু হ্যা—সূচক মাথা নেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরল। দেয়ালের দিকে
তাকিয়েই বলল, ‘যুমুর তুই কি আমার একটা কাঞ্জ করে নিবি?’

‘অবশ্যই দেব।’

‘একটা চিরনি কিনে জানবি। সুন্দর একটা চিরনি।’

‘চিরনি দিয়ে কী করবে?’

‘চিরনি দিয়ে মানুষ কী করে?’

‘তোমার তো চিরনি আছে এই জন্মেই জিজ্ঞেস করছি।’

‘মৰিম ভাইকে দেব। এই দিন দেখলাম ওর চিরনি নেই।’

‘আমিও তাই আদ্বাঞ্জ করছিলাম।’

‘জানালার পর্দা টেনে দে তো।’

যুমুর উঠে পড়ল। জানালার পর্দা টেনে দিতে বলার অর্থ — আমি এখন ঘূরুব। আপা
তাকে খুব ভদ্রভাবে বলছে, ‘তুই উঠে চলে যা।’

‘আপা তুমি চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?’

‘না।’

যুমুর ইতস্তত করে বলল, ‘তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাঙ্গিলাম আপা,
জরুরি কথা।’

‘বল।’

‘আমি এই বছর পরীক্ষা দেব না। সামন্নের বছর দেব।’

মিতু কিছু বলছে না। চোখ বন্ধ করে শয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে ঘূরিয়ে পড়েছে।

‘আপা আমি একদম পড়াশোনা করতে পারছি না। বই নিয়ে বসি অন্য কথা ভাবি।
সামন্নের বছর আমি খুব মন দিয়ে পড়ব। পরীক্ষায় দেখবে খুব ভালো করব। ঠিক আছে
আপা?’

মিতু চোখ না মেলেই বলল, ‘আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে একটা চিরনি কিনে
আন।’

‘এখনি ঘাব?’

‘এক সময় গেলেই হবে।’

‘পরীক্ষার ব্যাপারে তো তুমি কিছু বললে না।’

মিতু চাপা গলায় বলল, ‘পরীক্ষা দেয়া না—দেয়া তোর ব্যাপার। আমার আর বলার কী
আছে?’

‘রাগ করছ না তো?’

‘না। তুই এখন ঘৰ থেকে যা।’

যুমুর চিরনি কিনতে বের হয়ে গেল। তখন মণি চুকলেন শাহেদ। তাঁর হাতে
চায়ের কাপ। পিরিচে দু’টা বিসকিট। মিতু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, ‘চা খাব না
মা। তুমি খেয়ে ফেল। বিসকিটও খাব না।’

‘সকালে মাশতাও খাস নি।’

‘বিদে জমাছি। দুপুরে এক গামলা ভাত খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘূমুব।’

শাহেদা মেয়ের পাশে বসে চা খাচ্ছেন। মিতু বলল, ‘বিসকিট খাও মা। তোমার খাওয়া দেবি।’

‘খাওয়া দেখার কী আছে?’

‘অনেক কিছুই আছে। পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল খাওয়া। সেই খাওয়া দেখাটা তুচ্ছ করার মতো কিছু না।’

‘বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে, শনেছিস?’

‘ইঁ। ঝুমুরের কাছে শনলাম।’

‘বাড়ি দেখেছিস?’

‘না।’

‘এক তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে তো।’

‘বললেই তো বাড়ি ছেড়ে দেয়া যায় না।’

‘আমি বলেছি ছেড়ে দেব।’

‘বলেছ, তালো করেছ। আমি বুঝিয়ে বলব।’

‘আমি এখানে থাকতে চাই না। লোকজন আজেবাজে কথা তোর নামে ছড়াচ্ছে।’

‘যেখানে যাবে সেখানেও তো ছড়াবে।’

শাহেদা চুপ করে গেলেন। চায়ে বিসকিট ডিজিয়ে তিনি বিসকিট খাচ্ছেন। মিতু তাকিয়ে তাকিয়ে দেবছে।

‘আজ রাত্না কী মা?’

‘নলা মাছ নিয়ে এসেছিল। রাতে থাবি। দুপুরে ভাল ভাত।’

‘দুপুরেই রাঁধ মা। আরাম করে থাই। রাতে আমি থাকব না। রাতে শ্যটিং আছে।’

‘আজ শুক্রবার। শুক্রবারে তো শ্যটিং থাকে না।’

‘আজ আছে।’

‘ঐ দিন না বললি ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে?’

‘প্যাচওয়ার্ক বাকি আছে। কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার করা হবে।’

‘রাতে ফিরবি না?’

‘না।’

শাহেদা মুখ শক্ত করে বসে আছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাঘ জমছে। চায়ের কাপে তিনি এখন আর চুমুক দিচ্ছেন না। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন মিতু শংকিত গলায় বলল, ‘কিছু বলছ মা?’

শাহেদা ক্ষীণ শব্দে বললেন, ‘তোর বাবাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি। মুখটা খুব মালিন। তিনি বললেন— তুমি এত কষ্ট করছ কেন। কষ্ট করছ দরকার কি? এই টিনটা রাখ, এখানে ইন্দুর মারা বিষ আছে। তুমি নিজে খাও— মেঝে দু'টাকে খাওয়াও, দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে পেছে। এই বলে তিনি মুক্তি টিনের কোটা আমার হাতে দিলেন।’

‘রাতদিন এইসব তাৰ এই জন্মেই স্বপ্নে দেখেছ।’

‘তোর বাবা কথাটা কিন্তু ভুল বলে নি।’

মিতু হাসছে। শাহেদা বললেন, ‘হাসছিস কেন?’

‘এমনি হাসছি। তুমি খাল খাল করে নলা খাছ রাঁধ তো মা। ইদুর মারা বিষ আবার মিশিয়ে দিও না। আমার এখন মরার কোনোরকম ইচ্ছা নেই।’

শাহেদা নড়লেন না। বসেই রইলেন। মিতু বলল, ‘এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আজ আমি রান্না করি, রান্না করে তোমাকে খাওয়াই। তুমি চুপচাপ শয়ে বিশ্রাম কর। আরেকটা কথা শোন, সৎসারের সমস্যা নিয়ে তুমি মোটেও তাৰবে না। আমি কী কৰব তোমাকে বলি, বুমূরকে বিয়ে দিয়ে দেব। ওৱা আৱ পড়াশোনা হবে না। ওৱা পড়াশোনায় মন নেই। মোটামুটি ধৰনের একটা ছেলে দেখে ওৱা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। ওৱা চেহারা ভালো — ছেলে পাওয়া কোনো সমস্যা হবে না। তোমাকে আমি বলি নি। এৱ মধ্যেই একটা সম্ভব এসেছে। ছেলেটা ব্যাখকে চাকৰি করে। ছেট চাকৰি। তবে সৎসারের দায়দায়িত্ব নেই। দু'জন মিলে জো সুইহে থাকবে।

মবিন ভাই এৱ মধ্যে একটা চাকৰি পেয়ে যাবে। তখন আমি বিয়ে কৰব। তুমি থাকবে আমার সৎসারে। মাঝে মাঝে বুমূরকে গিয়ে দেবে আসবে। এখন তুমি আস তো আমার সঙ্গে, বান্নার সময় যদি ভুল-ভুল কৰি তুমি ধৰিয়ে দেবে। আরেকটা কথা মা— এৱ পৱে যদি কোনোদিন স্বপ্নে বাবাকে দেখ তোমার কাছে ইদুর মারা বিষ গছিয়ে দিতে চাচ্ছে তাহলে তুমি তাঁকে কিন্তু কঠিন ধৰক দেবে।’

মিতু বিছানা থেকে নামল। তাঁৰ মাকে হাত ধৰে তুলল। মিতুৰ মূৰ হাসি হাসি।

শাহেদা বললেন, ‘বুমূরকে বিয়ে কৰতেও চাচ্ছে যে তাৰ নাম কি?’

‘আমানুল্লাহ। অঞ্জলি ব্যাখকে কাজ কৰে।’

‘কী বকম কাজ? দারোয়ান টারোয়ান না তো?’

‘না দারোয়ান না, ক্লার্ক।’

‘তোকে সরাসৰি বলেছে?’

‘আমাকে বলে নি, মবিন ভাইকে বলেছে।’

‘ওকে কেন বলবে? ও কে? তাৰ কিছু বলাৰ থাকলে সরাসৰি তোকে কিংবা আমাকে বলবে। ছেলেটার দেশ কোথায়?’

‘আমি মা কিছুই জানি না। আমি খোঁজ নিয়ে বলব।’

‘কবে খোঁজ নিবি?’

‘আজই খোঁজ নেব। এফডিসিতে যাবার আগে মবিন ভাইজোৱা সঙ্গে দেখা কৰে তাৰপৰ যাব।’

মবিন শয়ে ছিল। মিতুকে দেখে ধড়মড় কৰে উঠেলেন। অবাক হয়ে বলল, ‘আৱ তুমি?’

মিতু বলল, ‘অবেলায় শয়ে আছ কেন?’

‘বেকাৰ মানুষেৰ আবার বেলা, অবেলা, কালবেলা? তুমি এই সময় যে?’

‘এটা কি নিষিদ্ধ সময়?’

‘না নিষিদ্ধ হবে কেন? এস? আমার চিরকনি এনেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘সিগারেট?’

‘না সিগারেট আনা হয় নি।’

‘কতক্ষণ থাকবে?’

‘বাত আটটা পর্যন্ত থাকতে পারি কিন্তু তোমার তো সময় হবে না।’

‘সময় হবে না তোমাকে কে বলল?’

‘সঙ্গ্রামবেলায় তোমার টিউশানি আছে না?’

‘ছিল— এখন নেই। সন্ধ্যাটায় আমি এখন স্বাধীন। গতকাল সন্ধ্যায় কী করেছি জান, একটা সিনেমা দেখে ফেললাম, ‘জনি দুশ্মন’। আশায় আশায় গিয়েছিলাম, হয়তো তোমাকে দেখব। জনি দুশ্মন ছবিতে ভূমি কাজ কর নি তাই না?’

‘না।’

‘টেপী কি করেছে? সুন্দর মতো একটা এক্সট্রা মেরে দেখলাম। নায়িকার সঙ্গে নদীতে পানি আনতে গেল।’

‘টেপী ঐ ছবিতে কষ্ট করেছে কিনা বলতে পারছি না।’

‘দেখা হলে জিঞ্জেস কোরো তো। ওর সঙ্গে এখন দেখা হয় না?’

‘কম হয়।’

‘ছবির ঐ মেয়েটাকে দেখে মনে হল, এ নিশ্চয়ই টেপী। মেয়েটার মাথাভর্তি চুল, জোড়া ভুরু।’

‘জোড়া ভুরু! তাহলে টেপী না। টেপীর জোড়া ভুরু না।’

মবিন আঘাতের সঙ্গে বলল, ‘টেপীর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ওকে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। একদিন তোমার সঙ্গে এফডিসিতে যাব। মেয়েটাকে দেখে আসব।’

‘আচ্ছা।’

‘ও আছে কেমন?’

‘ভালোই আছে। দারুণ এক বড়লোকের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। সেদিন এফডিসি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গেল।’

‘বল কী! সত্যি?’

‘হ্যাঁ সত্যি।’

‘টেপী নিশ্চয়ই খুব খুশি।’

‘না খুশি না। ও দেখলাম খুব ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠল। সেখাটা কানাকল্লা।’

‘কেন বল তো?’

‘বড়লোকরা গাড়ি পাঠিয়ে তো আর গুরু করার জন্যে নিয়ে যায় না, প্রেম করার জন্যেও নিয়ে যায় না— অন্য কারণে নিয়ে যায়। সবাই সেটা জানে। কাজেই সবার চেবের উপর দিয়ে বিরাট এক গাড়িতে করে যাওয়া খুব লজ্জার ব্যাপার না?’

‘অন্বন্তির ব্যাপার তো বটেই! দারুণ বড়লোকদের জনো দারুণ বড়লোক মেয়ে
পাওয়া সমস্যা না — তারা পথেঘাটের মেয়েদের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে কেন?’

মিতু হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘পথের মেয়েদের সঙ্গে যত সহজ হওয়া যায়
অন্যদের সঙ্গে তো তত সহজ হওয়া যায় না। পথের মেয়ের আগাদা আনন্দ আগাদা খিল।
যাই হোক টেপীকে নিয়ে আব কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। অন্য কিছু নিয়ে কথা বল।’

‘কী কথা শুনতে চাও?’

‘যা ইচ্ছা বল। তার আগে কাছে আস তো আমি তোমার চূল আঁচড়ে দিই। নাকি
আমি চূল আঁচড়ে দিলে লজ্জা লাগবে?’

‘না লজ্জা লাগবে না।’

মবিন এগিয়ে এল। খুব কাছে এল না। মাথা এগিয়ে দিল। যেন গায়ের সঙ্গে গা লেগে
শোলে মন্ত বড় অন্যায় হয়ে যাবে। মিতু চূল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, ‘তুমি কি ঝুমুরের
জন্যে একটা ছেলে জোগাড় করে দেবে? আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব।’

‘বাক্ষা মেয়ে বিয়ে দেবে কেন?’

‘ওর এখনই বিয়ে হওয়া ভালো। বিয়ে হলে মা মানসিক শান্তি পাবেন। মা ওকে
নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করেন। মা’কে আমি অবশ্যি বলেছি আমানুল্লাহ নামের এক ছেলে
ঝুমুরক বিয়ে করতে চায়। এতেই মা খুশি।’

‘আমানুল্লাহ কে?’

মিতু হাসতে হাসতে বলল, ‘আমানুল্লাহ কেউ না। আমার বানানো এক নাম। মা’কে
খুশি করার জন্যে গল্পটা তৈরি করা।’

‘তিনি খুশি হয়েছেন?’

‘হ্যা খুশি হয়েছেন। অভিনয় তো আমি ভালো পাবি— যাই বলি এত সুন্দর করে
বলি, সবাই বিশ্বাস করে।’

‘আমার কেলাতেও ভাই কর?’

‘না।’

‘কথনো না?’

‘মাঝে মাঝে করি। যখন করি তখন খুব খারাপ লাগে।’

মবিন হাসছে। মিতুও হাসছে। মিতু বলল, ‘চূল আঁচড়ানোটা ভালো হয়ে গিয়ে। এস
আবার আঁচড়ে দিই। এরকম শক্ত হয়ে থাকবে না— আমার শরীরে কৃষ্ণহয়ে নি যে ছেঁয়া
লাগলে তোমার ক্ষতি হবে।’

মবিন হড়বড়িয়ে বলল, ‘কী যে তুমি বল!’

‘ঠিকই বলি— তুমি আমার সঙ্গে সব সময় এমন ভাবতের যেন আমি তোমার ছাত্রী।
তুমি আমাকে পড়াছ এবং আমার মা একটু দূরে থালে পদ্মাসো কেমন হচ্ছে লক্ষ করছেন।’

মবিন হাসল।

মিতু কঠিন গলায় বলল, ‘আমি সামান্য এলটা মেয়ে হতে পারি কিন্তু আমার হাত
দু'টা সুন্দর। সুন্দর না? দেখ কী সুন্দর লস্বা লস্বা আঙুল।’

‘সে তো সব সময়ই দেখছি।’

‘হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখ। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে তোমার মান যাবে?’

মরিন বিশ্বিত হয়ে বলল, ‘আজ্জ তোমার কী হয়েছে বল তো?’

‘কিছু হয় নি। হবার মধ্যে যা হয়েছে তা হল তোমার দেয়া শাড়িটা পরেছি। বেগুনি রং আমার অসহ কিন্তু শাড়িটা পরার পর নিজেকে এত সুন্দর লাগছে কেন কে জানে। আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছি। তোমার কাছে কি আমাকে সুন্দর লাগছে না?’

‘লাগছে।’

‘সত্য লাগছে, না আমাকে খুশি করার জন্য বলছ?’

‘সত্য লাগছে।’

‘তাহলে তোমার আজ্জ ভয়ংকর বিপদ।’

‘তার মানে?’

‘আমি আজ্জ কোথাও যাব না। সারারাত গৱৰ কৱব। যদি ঘুম পায় তোমার এই থাটে তোমার পাশে শুয়ে থাকব। তোমার কি একটাই বাসিন্দা?’

মরিন তাকিয়ে আছে। তার চেবে পলক পড়ছে না। মিন্তু বলল, ‘এভাবে তাকিয়ে থাকবে না। আমি মন ঠিক করে এসেছি।’

‘তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।’

মিন্তু দীর্ঘনিশ্চাস ফেলে বলল, ‘তাই বোধহয়। ক’টা বাজে দেখ তো?’

‘সাতটা।’

‘তুমি ওঁ, স্যান্ডেল পরে নাও। আমাকে বাসে তুলে দেবে। রাতে আমার শৃঙ্খিং আছে। এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম। আমি কী সুন্দর অভিনয় পারি দেখলে তো? আমার কথা বিশ্বাস করে তায়ে যেমে-টেমে একেবারে অস্থির। এত তয় পাছিলে কেন?’

‘না মানে, শোক জানাজানি হলে তোমার অসম্ভাব্য। আজ রাতে তোমার শৃঙ্খিং’

‘ই। কিছু প্যাচওয়ার্ক দরকার পড়ে গেল। নরমাল টাইমে শিডিউল পাছিল না। আজই শেষ।’

‘শেষ হলেই ভালো। সারারাত জেগে কাজ করা কী বিশ্বী ব্যাপার!’

‘সবাই সুশী ব্যাপার করবে তা তো হয় না। কাউকে কাউকে বিশ্বী ব্যাপারও করতে হয়। আমরা কিন্তু রিকশা নেব না। হেঁটে হেঁটে বাসস্টেশন পর্যন্ত যাব। আমার ইঁটতে ইচ্ছা করছে।’

‘অনেকবারি রাস্তা তো।’

‘অনেকবারি রাস্তাই তোমার সঙ্গে হেঁটে পার করব। তুমি আশুক্ত হাত ধরে থাকবে। অস্ফকার রাস্তা— কেউ দেখবে না।’

মরিন বলল, ‘চল তোমাকে এফডিসি পর্যন্ত দিয়ে আসি।

‘কোনো দরকার নেই। আমি একাই যাব।’

‘আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধা আছে?’

‘আছে। একটাদের সঙ্গে যে সব পুরুষ মানুষ থাকে তাদের দালাল দালাল মনে হয়। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সবাই আড়মোখে তোমাকে দেখবে, আমার অসহ্য

ঝাইয়ে দেব। তুমি কী বল?’

‘সেটা মন্দ না।’

তারা বাসক্ষেত্রে চলে এসেছে। ঢাকা যাবাব বাস আসছে দেখা যাচ্ছে। মিতু বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বলল, ‘এতটা রাস্তা আমরা পাশাপাশি হেঁটে এলাম, তুমি কিন্তু একবারও আমার হাত ধর নি।’

‘ও সবি। দেখি তোমার হাত।’

‘থাক দেখতে হবে না। বাস চলে এসেছে।’

দিলদার খাঁ দরজা খুলেই বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, ‘এতক্ষণে। কটা বাজে আন?’

রেশমা লঙ্ঘিত ভঙ্গিতে বলল, ‘বাস পথে জ্যামের মধ্যে পড়েছে। আকসিডেটের জন্মে এয়ারপোর্ট পুরা দুষ্প্রটা বন্ধ। কী করব বলুন।’

‘রাত বাজে এগারটা, পার্টি এতক্ষণ তোমার জন্মে বসে থাকবে? আমার নিজেরও একটা বদনাম হয়ে গেল। কথা রাখতে পারলাম না।’

‘সবি দিলদার ভাই।’

‘এখন সবি বলে লাভ কি? রাত নাটা পর্যন্ত পার্টিকে ধরে রেখেছি। তারপর বাধা হয়ে অন্য ব্যবস্থা করেছি। হট করে তো কাউকে পাওয়া যায় না। পার্টির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে।’

রেশমা বলল, ‘আমি এখন কী করব?’

‘কী আর করবে? বাসায় চলে যাবে।’

‘এত বাতে বাসায় থাব না। তোরবেলা যাব। রাতটা আপনার বাসায় থেকে যাই।’

দিলদার বিরক্ত গলায় বলল, ‘আরে সর্বনাশ! বাসায় থাকতেই পারবে না। তোমার ভাবি এইসব ব্যাপারে অসম্ভব স্থিতি।’

‘বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকব।’

‘অসম্ভব। বসার ঘরের সোফা কেন, বারান্দায় শুয়ে থাকলেও সে বাঁটাপেটা করবে।’

রেশমা বলল, ‘ঠিক আছে থাকব না। ঘরে ঢুকতে দিন। তথকের তৃষ্ণা হয়েছে। এক প্লাস পানি থাব— তারপর ভেবে ঠিক করব কী করা যায়।’

দিলদার খাঁ নিতান্ত অনিষ্টায় দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

পুরোনো অসুখটা কি আবার তাঁকে ধরেছে? সেই ভয়ান্ত অসু? যে অসুখ গভীর গোপনে লুকিয়ে থাকে, হঠাত বের হয়। যখন বের হয়ে জোখন সম্ম চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে দেয়।

মোবাইল সাহেবের চিন্তা-চেতনা গুলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে আছেন তাঁর এল সি প্রি পারসোলাল কম্পিউটারের সামনে। পর্দায় দাবার বোর্ড। এবাবের চাল তাঁর দেয়ার কথা। পর্দায় ফ্ল্যাসিং সাইন উঠছে। সুন্দর চাল তাঁর আছে। মন্ত্রীর সামনের বড়ে এক ঘর এগিয়ে

দিবে প্রতিপক্ষের নাইটকে বেকায়দায় ফেলা। তিনি চাল দিচ্ছেন না। মৃত্তির মতো বসে আছেন। তাঁর লেজের থেকে একজন কেউ বলছে, অর্থহীন, এই চাল দেয়া অর্থহীন। কে বলছে? তাঁর পুরোনো অসুখটা বলছে?

হ্যাঁ সেই পশ্টটাই বলছে। কিন্তু পশ্টটাকে এখন আর পশ্ট বলে মনে হচ্ছে না। পশ্টের গলার শব্দ মধুর। প্রথম যৌবনের কিশোরী প্রেমিকার কষ্টস্বরের মতো। তাঁর প্রথম যৌবনে কেনে কিশোরী প্রেমিকা ছিল না। থাকলে অবশ্যই সে এরকম কষ্টে কথা বলত।

কষ্টস্বর বলল, ‘দাদার চাল দিয়ে কী হবে?’

তিনি যুক্তি দিতে চেষ্টা করলেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, ‘আনন্দ। খেলার আনন্দ। জয়-পরাজয়ের আনন্দ।’

‘জয়-পরাজয়ের আনন্দ সবার জন্যে নয়। এই খেলায় জয় করেও তুমি আনন্দ পাবে না। পরাজিত হয়েও তুমি আনন্দ পাবে না। একটু শুধু ক্লান্ত হবে। তুমি কি ক্লান্ত হবার জন্যে খেলছো?’

‘না।’

‘তাহলে শুধু শুধু খেলছ কেন?’

‘খেলছি না তো আমি বসে আছি।’

‘এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে?’

‘জানি না।’

‘অনন্তকাল বসে থাকবে?’

‘অনন্তকাল বসে থাকব কেন? আমি এখন উঠেব। হাত-মূখ ধোব, কফি খাব, তাবপর ঘূমুতে যাব।’

‘কারো কারো জন্যে সময় থেমে যায়। তোমার জন্যে সময় থেমে গেছে। তুমি যাই কর তোমাব কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল ধরে করছ। সত্যি না?’

‘হ্যাঁ সত্যি।’

‘তুমি যখন তোমার স্তুর সঙ্গে কথা বল— তোমার কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল থারে কথা বলছ। তুমি যখন হাতে কফির পেয়ালা নেবে তখন মনে হবে অনন্তকাল ধরেই কফির পেয়ালা হাতে তুমি বসে আছ।’

‘আমি কি অভিশঙ্গ?’

‘সব মানুষই অভিশঙ্গ। ওরা তা জানে না বলে ওরা হেসেখেলে জীবন ধূরস্ত করছে। তুমি জেনে গেছ। তোমার মতো আরো অনেকেই জেনেছে। আপানের মোবেল পুরস্কার পাওয়া সেই উপন্যাসিকের নাম যেন কি?’

‘কাওয়াবাতা?’

‘হ্যাঁ কাওয়াবাতা। তিনি যখন সব পেয়ে গেছেন উক্ত তিনি আত্মহত্যা করেন। এরকম উদাহরণ আরো আছে। আছে না?’

‘আছে? কবি মায়াকোভস্কি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে,... পুশকিনকেই বা বাদ দেবে কীভাবে?’

‘পুশ্কিন ডুয়েলে মারা গেছেন।’

‘একই কথা। ব্যাপার একই। জীবন তাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিলেন বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই। তৃমিও বুঝে গেছ...’

‘আমার বিশাল কর্মকাণ্ড, ব্যবসা...’

‘তাদের কর্মকাণ্ড কি তোমার চেয়ে কম ছিল?’

‘মৃত্যু আমাকে কী দেবে?’

‘কিছুই দেবে না। এটা কি অনেক বড় উপহার না?’

‘সে রকমই মনে হচ্ছে।’

‘একটা বইয়ের শেষ পাতায় কী শেখা থাকে — দি এন্ড। সমষ্টি। মৃত্যু তোমাকে শেষ পাতায় এনে দেবে। এটা কি আনন্দময় একটা ব্যাপার না?’

‘হ্যাঁ। আমাকে তুমি এখন কী করতে বল?’

‘তুমি তোমার কম্পিউটারে লেখ — The End. সুন্দর করে লেখ। কম্পিউটারের পর্দায় তিনি লিখলেন —

‘The End.’

‘এত ছোট করে লিখেছ কেন? বড় টাইপে লেখ। সব ফ্যাপিটেল লেটারে।’

তিনি লিখলেন —

‘THE END.’

আব তখন বিশ্বী শব্দে ইন্টারকম বাজতে লাগল। তিনি ইন্টারকমের রিসিভার কানে নিলেন। ইদরিস বলল, ‘স্যার দ্বামালিকুম।’

তিনি যান্ত্রের মতো বললেন, ‘কী ব্যাপার ইদরিস।’

‘একটা মেয়ে এসেছে সার। আগন্তব সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।’

‘কে এসেছে?’

‘এই বাড়িতে সে আগে একবার এসেছিল।’

‘টেলী?’

‘নাম বলল রেশমা।’

‘ও আচ্ছা।’

‘ওকে কী বলব স্যার?’

মোবারক সাহেব চুপ করে রইলেন। তার তেতরে সেই পও কিছু বলে কিন্তু শনাক্ত ক্ষেত্রে করলেন। কেউ কিছু বলছে না। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ‘ইদরিস রেশমাকে উপরে নিয়ে এস।’

‘ক্ষি আচ্ছা স্যার।’

রেশমা কাঠের সিঁড়ি বেঁয়ে ভয়ে ভয়ে উঠছে। সিঁড়িতে মাথায় মোবারক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। মোবারক সাহেবের মুখ হাসি হাসি।

তিনি দূর থেকে বললেন, ‘কী ব্যাপার বল তো?’

রেশমা ঘমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাকে একটু ধেন বিশ্বাস মনে হচ্ছে। সে বলল, ‘আমি আমার চুলের ফিতাটি ফেলে গিয়েছিলাম। নিতে এসেছি।’

মোবারক সাহেবের মনে হল, বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। সুলুর জবাব দিয়েছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে ঘনের ডেতেরের পশ্চাটাকে অনেকক্ষণের জন্যে আটকে রাখা যাবে।

‘তুমি কি ফিতা নিয়েই চলে যাবে?’

‘আপনি থাকতে বললে থাকব।’

দাঢ়িয়ে আছ কেন, এস! এস! মোবারক সাহেব হাত বাঢ়িয়ে দিয়েছেন। রেশমা ইত্তেজত করছে। মোবারক সাহেব বললেন, ‘ধর আমার হাত ধর।’

রেশমা হাত ধরল। মোবারক সাহেবের বললেন —‘তুমি হঠাত করে আসায় আমি যে কী ভয়ংকর খুশি হয়েছি তুমি কোনোদিনও তা জানবে না। তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাইবে তাই পাবে। এটাকে মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে ধরে নাও। বল কী চাও?’

রেশমা বলল, ‘আমি কি অন্য কারোর জন্যে কিছু চাইতে পাবি?’

‘হ্যাঁ পাব।’

‘আমার একজন অতি প্রিয় মানুষ আছে। চা বাগানের একটা চাকরির তার খুব শখ। তালো একটা চাকরি।’

মোবারক সাহেব বললেন, ‘আমার সঙ্গে আস। আমি কম্পিউটারে তার নাম-ঠিকানা তুলে নিছি। চম্পিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করব।’

মোবারক সাহেব তাঁর কম্পিউটার থেকে The end লেখা মুছে ফেললেন। জরুরি লেখা ফোন্ডার ওপেন করে বললেন —

‘বল রেশমা, নাম বল।’

রেশমা নাম বলল।

‘তুমি কি খেয়ে এসেছ?’

‘ছি না।’

‘আশচর্য! আমিও খাই নি। ইদরিসকে বলি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তুমি কী খেতে পছন্দ কর?’

‘আমি সবকিছুই পছন্দ করি। আপনি কী পছন্দ করবেন?’

‘জানি না। আসলেই জানি না। মজার ব্যাপার কী জান মিতু অনেকদিন পর কেউ আমাকে জিজেস করল, আমি কী পছন্দ করি —এই তদ্দেশীকের ঠিকানা কী বল? মেইলিং অ্যাড্রেস।’



বুমুরদের রান্নাঘর বারান্দায়। করোগেটেড টিন দিয়ে বারান্দার একটা অংশ আলাদা করে বান্নাঘর। চালে কয়েক জ্যাগায় ফুটো আছে। বৃষ্টির সময় ফুটো দিয়ে পানি পড়ে। রাঁধতে শাহেদার খুব যন্ত্রণা হয়। শাহেদা এই মহুর্তে যন্ত্রণার তেতুর দিয়ে যাচ্ছেন। বড়া ভাঙ্গার জন্যে তেল চড়িয়েছেন। বৃষ্টির পানি ফুটো তেলে এসে পড়ছে। ফুটো তেলের ছিটা তার মুখে এসে পড়ছে। মুখের খানিকটা তো অবশ্যই পুড়েছে। শাহেদাকে দেখে তা বোকার উপায় নেই। তিনি আহ উহ জাতীয় কোনো শব্দ করেন নি। তাঁর ব্যস্ততা চুগাটা নিরাগদ কোনো জ্যাগায় সরিয়ে নেয়ার দিকে। এই সময় বুমুর এসে বলল, ‘বাড়িওয়ালা এসেছে মা।’

শাহেদা বললেন, ‘কাল সকালে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে যেতে বল।’

‘বাড়ি ভাড়া নিতে আসে নি মা। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা। আমরা বাড়ি ছাড়ি নি এই নিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে।’

শাহেদা নির্বিকার গলায় বললেন, ‘করতে থাকুক।’

তিনি কেরোসিনের চুলা দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিলেন। সেখানে পানি আরো বেশি পড়ছে। বুমুর বলল, ‘মা তুমি আস উনি বিশ্বি বিশ্বি সব কথা বলছেন। বাড়ির সামনে লোক জমে গেছে।’

শাহেদা চুলা থেকে কড়াই নামালেন। মাথার উপর আঁচল তুলে দিলেন। বুমুর মা’র সঙ্গে গেল না। তার হাত-পা কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে ভয়ংকর একটা কাও হতে যাচ্ছে। এমন সময় হচ্ছে যখন আপা বাড়িতে নেই। আপা থাকলে যত ভয়ংকর হাঙ্গাই হোক সামাল দিতে পারত। এখন কে সামলাবে? এক ফাঁকে সে গিয়ে কি হাঙ্গাই ভাইকে নিয়ে আসবে? মাঝে মাঝে একজন গুরুত্ব মানুষের উপস্থিতির এমন প্রয়োজন পড়ে।

শাহেদা বারান্দার খোলা দরজার পাশে দাঁড়ালেন। বৃষ্টির উঠানে এবং রাস্তায় এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে তিনি কল্পনা করেন নি। ক্ষেত্র শুনে এরা জড়ো হয়েছে তাও মনে হচ্ছে না। বৃষ্টি মাথায় করে এতগুলো মানুষ জঙ্গে হবে না। নিজামউদ্দীন সাহেব মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে করেই এনেছেন। ফুটো তেল শাহেদার খুতনিয়ে কাছে পড়েছে। জ্যাগাটা কালো হয়ে ফুলে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি জমে ফেঁসকা উঠে যাবে। তীব্র যন্ত্রণা

হচ্ছে। শাহেদা বললেন, ‘কী হয়েছে?’

নিজামউদ্দীনের গলা শীতল। কষ্টস্বরে কোনো রাগ নেই। তাঁর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য পরিষ্কার। তিনি কথা বললেন উচু গলায় যাতে জড়ো হওয়া প্রতিটি মানুষ তার কথা শুনতে পায়।

‘কী হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কেন? কী হয়েছে স্টো তো আপনি বলবেন। একদিন তারিখ বাড়ি ছাড়ার কথা। আজ সাত তারিখ। বাড়ি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নাই। বাড়ি ভাড়া দেখার সাড়াশব্দ নাই। ভাড়া আমার দরকার নাই। বাড়ি ছাড়েন।’

শাহেদা শান্ত গলায় বললেন, ‘ছাড়ব তো বটেই। বাড়ি থেঁজছি। পাওয়া গেলেই ছেড়ে দেব।’

‘আমি খোঁজাখুঁজির কথা শুনতে চাই না। বাড়ি ছাড়বেন। আজ রাত্রেই ছাড়বেন।’

‘আজ রাত্রেই ছাড়তে হবে?’

‘অবশ্যই। ভদ্রপাড়ায় বাস করে দুই মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করবেন স্টো আর হতে দেয়া যায় না।’

‘আপনি কী বলছেন?’

‘গলা বড় করবেন না। আমি বড় গলার ধার ধারি না। ভদ্রলোকের পাড়ায় বাস করে ব্যবসা করবেন আর আমরা চূপ করে থাকব? চাকা শহরে ঝারাপ পাড়ার তো অভাব নাই, সেখানে শিয়ে ওঠেন। ব্যবসাও ভালো হবে। উঠতি বয়সের দুই মেয়ে!'

শাহেদা ভাঙা গলায় বললেন, ‘চূপ করুন। আমি আপনার পায়ে ধরছি। চূপ করুন। আজ রাত্রেই আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব। আসুক, মেমেটো আসুক।’

নিজামউদ্দীন হষ্ট গলায় বললেন, ‘মেয়ে ট্রিপ দিতে গেছে, এত সহজে কি আসবে? তার আসতে রাত দু'টা-তিনটা বাজবে।’

তিন্দের ভেতর থেকে একজন বলল, ‘চূপ করেন না ভাই, অনেক তো বললেন।’

শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। বুকের তেতুর প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে চিকিৎসা করে উঠলে বাথা করবে।

নিজামউদ্দীন খড়খড়ে গলায় বললেন, ‘আমি যা বলেছি সত্য কথা বলেছি। যদি মিথ্যা বলি আমার উপর যেন আঢ়াহার গঁজব পড়ে। ভারপ্রেও বলতেছি— বাতটা থাকেন, পরের দিনটাও থাকেন। ব্যস। পরশুদিন সকালে ফেল দেখি বাড়ি পরিষ্কার। ভাড়া বাক্সি পড়েছে— দেয়া লাগবে না। মেয়ে খাটো প্যাসার আমার দরকার নাই।’

নিজামউদ্দীন নেমে যাচ্ছেন। যুদ্ধজয়ীর ভঙ্গিতে নামছেন। বৃষ্টিপুরেগত বাড়ছে। বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া লোকজন চলে যাচ্ছে। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেছে। নিখাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

‘বুমুর এসে ডাকল, ‘মা মা।’

শাহেদা তাকালেন না। বড় বড় করে নিশ্চাস নিতে আগলেন।

‘মা তুমি বিছানায় এসে শোও।’

বুমুর মা’র হাত ধরল। শাহেদার ইচ্ছা করল প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে মেয়ের হাত সরিয়ে দেল কিন্তু তিনি কোনো জোর পাচ্ছেন না। তাঁর শরীর পাথির পালকের মতো হালকা

ଲାଗିଛେ । ସୁମୂର ହାତ ଧରେ ତାକେ ବିଛାନାୟ ଏଣେ ଶୁଣ୍ୟେ ଦିଲ । କାଦ କାଦ ଗଲାୟ ବଲନ, 'ମା ତୁମ ଏବକମ କରଛ କେନ?' ଶାହେଦା ବିଡ଼ବିଡ଼ କରେ କିମ୍ବା ଯେଣ ବପନେନ । ତାର ହାତ-ପା ଘାମିଛେ । ସୁବ ଭୁକ୍ତା ବୋଧ ହଜେ । ମେମେକେ ପାନି ଏଣେ ଦେବାର କଥା ବଲତେ ପାରନେନ ନା । ଜିଭ ଭାବି ହେଁ ଗେହେ । ଅଚଞ୍ଚ ସୁମୁର ପାଛେ । ଏହି ସୁମୁର କି ଶେଷ ସୁମ? ମେଯେଶ୍ଳୋକେ କର୍ଯେକଟା କଥା ବଲେ ଯେତେ ଚାହିଲେନ । ବଲା ବୋଧହ୍ୟ ସନ୍ତ୍ଵନ ହବେ ନା । ଢାଖେ ଆଲୋ ଲାଗିଛେ । ତିନି ଚୋଥ ବନ୍ଧ କରେ ଫେଲିଲେନ ।

ଆବାର ସବନ ଚୋଥ ମେଲିଲେନ ତଥନ କରନ୍ତ ଏକଟା ମୁଖ ତାର ମୁଖେର ଉପର ଝୁଁକେ ଆଛେ । ସେଇ ମୁଖ ଗଭୀର ଫମତାଯ ଜାନିଲେ ଚାଇଲ, 'କେମନ ଆହ ମା? ଚିନିତେ ପାରଛ ନା ଆମାକେ? ଆମି ମିତ୍ତ ।'

ଶାହେଦା ଝାଣସିରେ ବଲିଲେନ, 'ପାନି ଖାବ ।'

ମିତ୍ତ ପାନିର ଗ୍ଲାସ ନିଯେ ଏଲ । ଚାମଚ ନିଯେ ଏଲ । ସେ ଚାମଚେ କରେ ମା'କେ ପାନି ଖାଓସାତେ ଯାଛେ କିନ୍ତୁ ତାର ହାତ ଏତ କାପିଛେ ଯେ ଚାମଚ ଥେକେ ଛଲକେ ପାନି ପଡ଼େ ଯାଛେ । ମିତ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ । ନିଚେର ଠୌଟ କାମଡେ ଧରେ କାନ୍ଦିଲେ । ଏତ ବେଶ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତାର ଶରୀର କେପେ କେପେ ଉଠିଛେ । ଶାହେଦା ବଲିଲେନ, 'କାନ୍ଦିଲ୍ ନା ମା ।' ତିନି ମାଥା ସୁରିସେ ସୁମୂରକେ ଝିଜିଲେନ । ମିତ୍ତ ବଲନ, 'ସୁମୂରକେ ପାଠିଯେଛି ମବିନ ଭାଇକେ ଆନିଲେ ।'

'କ୍ୟାଟା ବାଜେ?'

'ରାତ ବେଶି ହୟ ନି ମା, ଆଟଟା ।'

ଶାହେଦା ମେମେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆବାରୋ ବଲିଲେନ, 'କାନ୍ଦିଲ୍ ନା ।'

ମବିନେର ଘରେର ସାମନେ ସୁମୂର ଦାଁଡିଯେ ଆଛେ । ସର ବନ୍ଧ, ତାଳା ବୁଲିଛେ । ନିଚତଲାର ଦରଙ୍ଗିର ଦୋକାନ ଖୋଲା । ସେଥାନ ଥେକେ ସେଲାଇ ମେଶିନେର ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ଆସିଛେ । ଭୟ ସୁମୂର ଅସ୍ତିର ହେଁ ଗେହେ । ସେ କିମ୍ବା କରବେ ବୁବତେ ପାରନେନ ନା । ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛେ । ସେ ଦାଁଡିଯେ ଆଛେ ଦେୟାଳ ସେବେ । ମାଥାର ଉପର ଛାଦେର ମତୋ ଏକଟୁ ଆଛେ ବଲେ ବୃଷ୍ଟିତେ ଭିଜିଛେ ନା । ତାତେ କି? କତଞ୍ଚଣ ସେ ଏହିଭାବେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକବେ? ସେ ଯେ ସିଙ୍ଗି ବେଯେ ଉପରେ ଉଠିଛେ ତା ଦରଙ୍ଗିର ଦୋକାନେର ଲୋକଟା ଦେଖେଛେ । ମେଶିନ ବନ୍ଧ କରେ ଥାନିକଞ୍ଚଣ ତାକିଯେ ଛିଲ । ସୁମୂରେର ମନେ ହଜେ ସେଇ ଲୋକଟା ଉପରେ ଉଠି ଆସିବେ । ଏକା ଆସିବେ ନା, ଦୁ-ଏକଙ୍ଗନ ବନ୍ଦୁବାନ୍ଦୁବ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଆସିବେ ।

ସୁମୂର ଏଥନ କି କରବେ? ବାସାଯ ଫିରେ ଯାବେ? ବାସାଯ ଫିରେ ଯାବାର ପଞ୍ଚେତ୍ତୋ ସୁମୂର ତାକେ ଧରେ ଫେଲିଲେ ପାରେ । ଏମନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରା । ତାରା ଯଦି ରିକଶା ଥାମାୟ । ରିକଶା ଥାମିଯେ ଝୋପବାଡ଼େର ଦିକେ ନିଯେ ଯାଏ? ଚିକାର କରେ ଉଠିଲେ ଲାଭ ହାତେନ୍ । ଏଥନକାର ସମୟ ଏମନ ଯେ ଚିକାର ଶନଲେ କେଟ ଆସେ ନା । ବରଂ ଦୂରେ ସନ୍ଧେ ଯାଏ ।

ବୃଷ୍ଟି ଜୋରେ ନେମେହେ । ସୁମୂରେର ପା ଭିଜେ ଯାଛେ । ନିଚେର ସେଲାଇ ମେଶିନେର ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ଏଥନ ଆର ଶୋନା ଯାଛେ ନା । ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟଇ ମେଶିନ ବନ୍ଧ କରେ ଉପରେ ଉଠି ଆସିଛେ ।

ସୁମୂରେର ଗା ବିମ ବିମ କରିଛେ । ମନେ ହଜେ ସେ ମାଥା ସୁରେ ପଡ଼େ ଯାଏ । ତାର ଯେ ଏତ ଭୟକର ବିପଦ ତା କେଟ ଜାନିଲେ ପାରନେନ ନା । ଦରଙ୍ଗିର ଦୋକାନେର ଲୋକଟା ତାକେ କୋଳେ

একটা খুগড়ি ঘরে চুক্তিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে — তারপর সারারাত ধরে কুৎসিত কাঞ্চকারখানা করবে। তোরবাতে গলা টিপে মেরে ফেলে রাখবে ধানক্ষেতে। এইসব ক্ষেত্রে এরকমই হয়।

বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিছে। ঝুমুর এখন পুরোপুরি ভিজে যাচ্ছে। সিডিতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আসছে, দরজির দোকানের লোকটা আসছে। ভয়ংকর কাণ্টা ঘটতে যাচ্ছে। সে এখন কী করবে? ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে? এত সাহস কি তার আছে? এমনও তো হতে পারে যে দরজির দোকানের লোকটা না মরিন ভাই-ই আসছেন। যদি মরিন ভাই হয় সে প্রথমে আমলে একটা চিংকার দেবে এবং ছুটে পিয়ে মরিন ভাইকে জড়িয়ে ধরবে। এতে মরিন ভাই কিছু মনে করলেও তার কিছুই যায় আসে না।

না, মরিন ভাই না। দরজির দোকানের লোকটা। লম্বা কালো, রোগা একটা লোক। কী বিশ্বী তাবে সে তাকিয়ে আছে! ঝুমুর আয় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। লোকটা বলল, ‘মরিন সাহেবের থোঁজে আসছেন?’

ঝুমুর কোনো উত্তর দিল না : তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

‘বৃষ্টিতে ভিজতেছেন। নিচে বসেন। আসেন।’

বদমারেশ লোকটা তাকে ভুলিয়ে তালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেনেও ঝুমুর যাচ্ছে। কারণ না গিয়ে সে কী করবে? কী হবে চিংকার করে।

‘সাবধানে নামবেন, সিডি পিছল।’

ঝুমুর নিশ্চিত হল সিডি পিছল এই অজ্ঞাতে লোকটা তার হাত ধরবে। আজ্ঞা ঝুমুর কি পারে না প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সিডিতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে। তার জন্যে খুব বেশি সাহস কি লাগে? আজ্ঞা আল্লাহ! কিছু কিছু মনুষকে এত কম সাহস দিয়ে পাঠান কেন? তাকে যদি আর একটু বেশি সাহস দিয়ে পাঠান্তেন। সামান্য বেশি, তাহলে তাঁর এয়ন কী ক্ষতি হত?

ঝুমুর দোকানে ঢুকেছে। দোকানে লোকটা একা না। আট-দশ বছরের একটা ছেলেও আছে। সে শার্টের বেতনয় লাগাচ্ছে। লোকটা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘বসেন।’

ঝুমুর বসল। না বসে সে কী আর করবে। লোকটা এখন কী করবে ঝুমুর জানে। কোনো একটা অজ্ঞাতে ছেলেটাকে বাইবে পাঠিয়ে দেবে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

‘মরিন সাহেব বাসাতেই থাকে। আজ যেন কোথায় গেছে। এসে পড়বে।’

ঝুমুরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বল। পরিস্থিতি শুন্তু একটু স্বাস্থ্যিক করা।

‘চা থাবেন?’

ঝুমুর হ্যাঁ না কিছু বলল না। লোকটা পকেট থেকে পাঁচ টাঙ্কা একটা নোট বের করে বলল, ‘ইসমাইল দৌড় দে।’

ঝুমুর যা ভেবেছে তাই — ছেলেটাকে সরিয়ে সিঙ্গুলারি তার ইচ্ছা করল চিংকার করে বলে, ব্যবহার তুই যাবি না, তুই বসে থাক।

ছেলেটা ছেট একটা কেতলি হাতে উঞ্চার মতো বের হয়ে গেল। মনে হয় চা-আনার কাঞ্চ তার খুব পছন্দ।

লোকটা একটা তোয়ালে বুমুরের দিকে বাঢ়িয়ে ধরেছে। বুমুর বলল, ‘মাথা মুছতে হবে না।’ লোকটা তোয়ালে রেখে দিয়ে সহজ গলায় বলল, ‘ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার কিছু নাই। মিনি সাহেব আসতে দেরি করলে আমি আপনাকে বাসায় দিয়া আসব।’

বুমুর যা তেবেছে তা হচ্ছে না। ছেলেটা চলে যাবার পরও লোকটা দরজা বন্ধ করেছে না। বরং ছেলেটির ফেলে যাওয়া শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। শার্টের বোতাম লাগানোর কাজগুলো সাধারণত মেঘেরা করে। ছেলেদের এই কাজ করতে দেখলে একটু অশ্রদ্ধা লাগে।

‘এই দোকানটা কি আপনার?’

‘না, আমি একজন কর্মচারী।’

‘আপনার বাসা কোথায়?’

‘বাসা-টাসা নাই।’

‘রাতে ধাকেন কোথায়?’

‘দোকানেই ধাকি।’

‘যাওয়াদাওয়া কোথায় করেন?’

‘হোটেলে খাই।’

বুমুর খুব অবাক হচ্ছে। কারণ সে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। অগ্রহ করে কথা বলছে। অবশ্যি কথা না বলেই বা কী করবে? দুঃসন্ত মানুষ তো চৃণচাপ বসে থাকতে পারে না। তাছাড়া মানুষটাকে তার এখন খুব তন্ত্র, খুব বিনয়ী মনে হচ্ছে। হোট কাজ যারা করে তারাও তন্ত্র হচ্ছে পারে বল্ছি হচ্ছে পারে।

ছেলেটা চা নিয়ে এসেছে। তিনটা কাপ বের করল, ছোট ছের্ট কাপ, কাপের নাইজ যে এত ছোট হতে পারে বুমুরের ধারণা ছিল না। তারা তিনজনই চুকচুক করে চা খাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি মজা করে চা খাচ্ছে ছেট ছেলেটা। প্রতিবারই রূমুক দিয়ে আহ্ করে উঠেছে। বাইবে বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। ছেট ছেলেটা দাঁত বের করে বলল, ‘শহীদ নাই তুফান আইতাছে।’ যেন তুফান আসা খুব আনন্দের ব্যাপার। বুমুর বলল, ‘আমার মা’র খুব খুরীর ধারাপ এই ঘনে মিনি ভাইকে নিয়ে এসেছি।’

‘কী হয়েছে?’

‘অজ্ঞান হয়ে গেছে।’

‘আম ফেরে নাই?’

‘আমি যখন আসি তখনো ফেরে নাই।’

‘বলেন কী?’

বুমুরেরও মনে হল আরে তাই তো। এতক্ষণে একজনেও তার মা’র কথা মনে হয় নি। সে বেশ আরাম করে চা খাচ্ছে। মা কেমন আছে কে জানে। মারা যাও নি তো? বুমুর উঠে দাঁড়াল। কীগুরে বলল, ‘আমি চলে যাব।’

শহীদ নামের লোকটা বলল, ‘চলুন আমি সঙ্গে যাই।’

বুমুর কোনো আপত্তি করল না। লোকটাকে তার ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে।

শহীদ ঝুমুরকে বাড়ি পৌছে দিয়েই ডাক্তার আনতে গেল। এবং মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার রাজপ্রেসার মাপলেন। প্রেসার কমাবার ওষুধ দিলেন। শহীদ ওষুধ আনতে গেল। ছাতা নেই, ভিজতে ভিজতে গেল।

মিতু বলল, ‘লোকটা কে রে?’

ঝুমুর বলল, ‘আমার চেনা একজন।’

‘চেনা মানে কি? কীভাবে চিনিস? পরিচয় হয়েছে কোথায়?’

ঝুমুর জবাব দিল না। মিতু চিপ্তিত গলায় বলল, ‘কত দিনের পরিচয়?’

ঝুমুর বলল, ‘অনেক দিনের।’

‘অনেক দিনের মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কি আবাহ আসে নাকি? কথা বলছিস না কেন? কী করে?’

‘শার্টের বোতাম লাগায়।’

‘তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?’

‘ফাজলামি করছি না, যা সত্ত্ব তাই বলছি।’

‘বাদরের মতো দেখতে একটা লোক, তার সঙ্গে তোর এত খাতির কীভাবে হল?’

‘তুমি এত বাগছ কেন আপা?’

‘যা আমাকে বল এত খাতির কীভাবে হল?’

‘তোমার হৈচৈ শুনে মা জেগে যাবে আপা।’

মিতু বিশ্ব নিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর বলল, ‘আপা উনি ওষুধ নিয়ে আসার পর উনাকে রাতে খেয়ে যেতে বলি? কোরা হোটেলে থায়। হোটেলের কুৎসিত খাবার খেয়ে খেয়ে শরীরের কী হাল করেছে দেখেছ?’

‘তুই বুবই আশৰ্য্য একটা মেয়ে রে ঝুমুর।’

‘রাতদুপুরে মিনি ভাই যদি এরকম ছোটাছুটি করত তুমি কি তাকে না খাইয়ে বিদেশ করতে?’

‘মিনি ভাই আর সে এক হল?’

‘এক ভাবলেই এক।’

মিতু তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর সেই তীব্রদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, ‘চারটা চাল বসিয়ে দেব আপা?’

‘যা ইচ্ছা কর।’

‘বেঙ্গল আছে। বেঙ্গল তেজে ফেলি?’

‘যা ডাঙতে ইচ্ছে করে সব তেজে ফেল।’

মিতু অবাক হয়ে দেখল ঝুমুর সত্ত্ব সত্ত্ব ঝালাঘরের লিঙ্কে যাচ্ছে। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল?

শহীদ খাবারের কথা শনে আকাশ ধেকে পড়ল। ঝুমুর বলল, ‘না না করলে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। গামছাটা দিয়ে ভালোমতো মাথা মুছে ফেলুন।’

‘আমি খাব না। অন্য কোনো দিন এসে ...’

‘আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। না খেয়ে আপনি যেতে পারবেন না।’

শহীদ অশ্বত্তিতে মরে যাচ্ছে। মেয়েটার কাঁধকাঁখানা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।
মেয়েটা কি পাখলা টাইপের?

বুমূর বলল, ‘খাবার কিছু নেই— বেগুন তাজা, ডাল আর আলুতর্তা। আপনার কষ্ট
হবে।’

মিতু বলল, ‘উনি খেতে চাহেন না, তুই এত জোর করছিস কেন?’

‘এত বাতে উনি হোটেলেও কিছু পাবেন না, না খেয়ে থাকবেন নাকি?’

শহীদ মরমে মরে শিয়ে মিতুর দিকে তাকাল। মিতু বলল, ‘আপনি খেয়ে যান। বুমূর
চট করে খাবার দিয়ে দে।’

মিতু মা’র ঘরে বসে আছে। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছ — মাথা
নিচু করে মানুষটা খাচ্ছে। তার সামনে বুমূর বসে আছে। সে খাবার তুলে দিচ্ছে। কী যেন
আবার নিচু গলায় বলছে। কী বলছে? বলুক যা ইচ্ছা।

শাহেদা ঘূম ভেঙ্গেছে। শাহেদা বসলেন, ‘ছেলেটা কে রে?’

মিতু বলল, ‘আমি জানি না মা।’

শাহেদা বললেন, ‘যার ইচ্ছা আসছে, খেয়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না মা,
কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘তুমি চিন্তা কোরো না মা। আমার মনে হয় না চিন্তার কিছু। তুমি ঘুমিয়ে থাক।’

শাহেদা চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বৰ্দ্ধ। বদ্ধ চোখের কোণা বেয়ে পানি পড়ছে।
ঘরে আলো নেই বলে মিতু তা দেখতে পাচ্ছে না।

বুমূর চাদরে সারা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে। মাথাও চাদরের নিচে ঢুকানো। আজ সে
এক ঘূমবে। মিতু ঘূমবে মা’র সঙ্গে। ঘূমতে খাবার আগে সে বোনের ঘরে ঢুকল।
বিছানায় বসতে বসতে বলল, ‘ঘূমছিস নাকি বুমূর?’

বুমূর জবাব দিল না। মিতু বলল, ‘তুই জেগে আছিস আমি জানি। মুখ থেকে চাদর
সরা।’

বুমূর চাদর সরাল। মিতু বলল, ‘ছেলেটা কে?’

‘জানি না।’

‘জানি না মানে? ওর নাম কি?’

‘শহীদ।’

‘তোর সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?’

‘আজই পরিচয় হয়েছে।’

‘সে কী?’

‘মবিন ভাইয়ের বাসার নিচে দরজির দোকানে কাজ করে। আমাকে তাদের ঘরে
নিয়ে গেল। চা খাওয়াল।’

‘আর তুই তাকে এরকম খাতির-যত্ন করে দিলি। না জানি সে কী তাৰছে?’

বুম্বুর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বলল, ‘পরশুদিন সকালে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আপা।’

‘পরশুদিন আসুক তখন দেখা যাবে।’

‘তুমি তো আজকের কাও দেখ নি— আজকের কাও দেখলে তোমার আকেলগুড়ুম হয়ে যেত।’

‘তোর কাও দেখে আমার আকেলগুড়ুম হয়ে গেছে।’

বুম্বুর মাথা নিচু করে খুব হাসছে। হাসি দেখে মিতুর বড় মাঝা লাগল। হঠাৎ সে বলল, ‘আয় তো বুম্বুর তোকে একটু আদর করিব।’ বুম্বুর চোখ তুলে তাকাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপাকে জড়িয়ে ধরল।

দু’বোন দু’জনকে জড়িয়ে ধরে অনেক বাত পর্যন্ত কাঁদল। কেন কাঁদল তারা জানে না।

এক সময় বুম্বুর চোখ মুছে লজ্জিত ভঙ্গিতে ডাকল, ‘আপা!'

‘কি?’

‘আমরা এত কানুকাটি করছি কেন?’

‘আমি কী জন্যে কাঁদছি সেটা আমি জানি, তুই কী জন্যে কাঁদছিস সেটা তোর জানার কথা।’

‘আমি জানি না।’

‘না জেনেই ডেউ ডেউ করে কাঁদছিস?’

‘হঁ। আপা শোন — ’

‘বল শুনছি।’

‘পরশু কী হবে বল তো— বাড়িওয়ালা চাচা যখন আসবে তখন তুমি যদি না থাক?’

‘আমি না থাকলে তুই তো থাকবি। তুই সামলাবি।’

‘আমি সামলাব? তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? কী সব কৃৎসিত কথা যে লোকটা বলছিল!’

‘বলুক না। এক সময় বলার কথা শেষ হয়ে যাবে।’

‘লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কৃৎসিত কৃৎসিত কথা বলবে তখন আমি কী করব?’

‘তুই ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হবি। তাতেই কাজ হবে। কিছু মৌন্যের সিম্পাতি গেয়ে যাবি। যদি কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাস তাহলেও আর দেখতে হবে না। সব লোক তোর পক্ষে চলে আসবে।’

‘কী যে তোমার কথা আপা!’

মিতু হাসতে হাসতে বলল, ‘ইচ্ছা করলে লোকটাকে আমরা কঠিন শান্তি দিতে পারি। কীভাবে জ্ঞানিস?’

‘কীভাবে?’

‘খুব সহজ— কাঁদতে কাঁদতে ছেট্ট একটা অভিনয় করতে হবে। লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে— যখন তখন আমাদের বাসায় আসত। কথনো পাকা পেঁপে নিয়ে

আসত, কখনো কলা, কখনো আম নিয়ে আসত। একদিন থারাপ একটা ইঞ্জিত করে। আমরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেই। তারপর থেকে সে আমাদের ভাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে গেগেছে।'

'কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'করবে। মানুষের চরিত্রের দিকে ইঞ্জিত করে যাই বলা হয় তাই সবাই বিশ্বাস করে।'

'তুমি বলতে পারবে এমন কথা?'

'না।'

'পরশুদিনের কথা ভেবে আমার এমন অঙ্গির লাগছে।'

'অঙ্গির নাগার কিছু নেই। পরশুদিন কেউ আসবে না। আমি ব্যবস্থা করব।'

'কী ব্যবস্থা করবে?'

'সেটা তোর জানার দরকার নেই। তবে নিশ্চিত থাক পরশুদিন কেউ আসবে না।'

'কী ব্যবস্থা তুমি করবে সেটা না জানলে আমি নিশ্চিত হতে পারব না। আমি যুক্তেও পারব না।'

'আমার চেনা একজন মানুষ আছে। তাকে জানালেই আর কোনো সমস্যা হবে না।'

'উনি কি ভয়ংকর কোনো মানুষ?'

'মোটেই না। আমুদে একজন মানুষ। কিন্তু তার ভয়ংকর ক্ষমতা।'

'এরকম মানুষকে তুমি চেন কীভাবে?'

'বেঁচে থাকার জন্যে অনেক রকম মনুষকে চিনতে হয়। অনেক কুৎসিত কাওকারখানা করতে হয়।'

'বেঁচে থাকাটা কি এতই জরুরি?'

মিতু ছেট্টি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থাকা খুব জরুরি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় মোটেই জরুরি না।'

'কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকাটা জরুরি?'

'ঘূর পাছে — জ্যে পড়।'

'না বল — কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকাটা জরুরি?'

মিতু নিচু গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে শৃঙ্খিং শেষ হবার পর — অনেক ব্যাক্তিবাসায় ফিরি। পথে মনে হয় তুই আমার জন্যে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছিস। পথে কোনো রিকশা দেখলেই চট করে উঠে দাঢ়াচিস, তখন বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি মনে হয়। মাঝে মাঝে শেষরাতের দিকে হঠাত মনে হয় যা আমার কপালে হাত দেয়ে দোয়া পড়ছেন, তখন বেঁচে থাকাটা জরুরি মনে হয়। শুধু জরুরি না, অস্ত্রব জরুরি মনে হয়।'

'তুমি আসল কথাটা কিন্তু আপা বল নি। আসল কথা ভাড়িয়ে গেছ।'

'আসল কথাটা কী?'

'আমরা কিছু না — মধিন ভাইয়ের কথা তোমার যখনই মনে হয় তখনি বেঁচে থাকাটা তোমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়। ঠিক বলেছি না আপা?'

‘হয়তো ঠিকই বলেছিস।’

‘হয়তো না—আমি জানি এটাই আসল সত্য, বাকি সব মকম সত্য।’

‘ব্যসের তুলনায় তুই বেশি বেশি জেনে ফেলেছিস। জানা ভালো, তবে বেশি জানা ভালো না।’

বুমুর বিছানায় উঠে বসতে বলল, ‘ধূৰ দুঃখী মানুষেরও বোধহয় বেঁচে থাকা জরুরি মনে হয় তাই না আপা।’

‘হয় বোধহয়। নয়তো তারা বেঁচে থাকে কেন?’

‘সবাই তো আর বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ আবার মরেও যায়। বিহু থায়। গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে। কেন পড়ে?’

‘জানি না কেন?’

‘মাবিন ভাইকেও প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিসাম — উনি উজ্জ্বল দিতে পারেন নি।’

‘তাকে আবার কথন জিজ্ঞেস করেছিস?’

‘ঐ দিন স্কুল থেকে চিফিল পিপিলিডে পালিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম। তাঁর ঘরে কী সুন্দর একটা শীতলপাটি পাতা! আমাৰ সব সময় মনে হয়েছে তাঁৰ ঘৰটায় একা একা হাত-পা ছড়িয়ে শীতলপাটিতে ঘূমুতে পারলৈ ধূৰ একটা আৱামেৰ ঘূম হবে। সেই জন্যে গিয়েছিলাম। তখন প্রশ্নটা কৱলাম।’

মিতু ভীষ্ণু গলায় বলল, ‘ঘূমিয়েছিলি?’

‘হঁ। মাবিন ভাই ঘরের ভেতর আমাকে রেখে তালা দিয়ে ছাঁত পড়াতে চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা এসে তালা খুললেন। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘূমিয়েছি। কী শান্তিৰ ঘূম যে ঘূমিয়েছি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘তুমি কি রাগ কৱলে আপা?’

‘না।’

‘কিন্তু তোমার গলার স্বর কেমন কঠিন কঠিন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমি রাগ কৱেছ।’

পাশের ঘর থেকে শাহেদো ডাকলেন, ‘মিতু, এই হিতু।’

মিতু উঠে গেল। বুমুর আবার চাদর দিয়ে সারা শরীর দেকে ফেলল। তাঙ্গু দিয়ে শরীর ঢাকামাত্র আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। সেই জগতে কৃত কাও হয়। আধোঘূম আধোঘূম জাগরণে বুমুর তার বহসাময় জগতে ঘূরে বেড়াচ্ছে অশাল।

এখন সে হয়েছে দারুণ বড়লোকের এক মেয়ে। ঘর থেকে সে পালিয়ে চলে এসেছে। তাকে খোঁজার জন্যে ইলঙ্কু পড়ে গেছে। দুলাখামুক্তি পুরস্কৃত পর্যন্ত ঘোষণা কৰা হয়েছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাওয়া যাবে কী করে, সে অতি সাধারণ একটা জায়গায় লুকিয়ে আছে। একটা দরজিৰ দোকানে। দরজিৰ দোকানেৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম শাহেদ। সে রাতে দুরজা বন্ধ কৰতে গিয়ে দেখে এক কোলায় রাজকন্যাদেৰ মতো একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে বলল, ‘কে?’

যুমুর বলল, ‘আমি নীলাঞ্জনা (রাজকন্যার নাম নীলাঞ্জনা চৌধুরী)।

‘আপনি এখানে কেন?’

‘আমি কয়েকদিন শুকিয়ে থাকব। আপনি কি আমাকে শুকিয়ে রাখতে পারবেন না?’

‘আপনার মতো ঝুপবতী যেয়েকে আমি কোথায় শুকিয়ে রাখব?’

‘শুকিয়ে রাখতে না চান না রাখবেন, শুধু আজ রাতটা থাকতে দিন, আমি ভোরবেলা চলে যাব।’

‘রাতে কোথায় যুমুবেন?’

‘কেন আপনার খাটে যুমুব। আপনি একদিকে তাকিয়ে যুমুবেন, আমি অন্যদিকে তাকিয়ে যুমুব। যাবখানে একটা বালিশ দিয়ে রাখব যাতে গায়ের সঙ্গে গা লেগে না যায়।’

‘আপনি তো ভয়ংকর কথা বলছেন।’

‘আমি মোটেই ভয়ংকর কথা বলছি না। আমি সহজ সাতাবিক কথা বলছি।’

যুমুর নীলাঞ্জনা চৌধুরীর ভূমিকায় অনেক রাত পর্ফন্ট অভিনয় করল। তার যুম এল শেষরাতে। তখন মোরগ ডাকতে শুরু করেছে।



মাগরিবের নামায়ের পর মবিন তার ছাত্রীর বাড়িতে যায়। গরমের দিন বলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে আয়ান পড়ে। সাতটা থেকে ন'টা—এই দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে পড়ায়। মাঝখানে ইন্টারভালের মতো হয়। ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'জন উঠে চলে যান। তখন তার জন্যে চা আসে—লেবু চা। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা ঢেকেন। পড়াশোনা শুরু হয়। দেয়াল ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা পড়ামাত্র ছাত্রী প্রথমে ঘড়ির দিকে, তারপর তার মা'র দিকে তাকায়—এর অর্থ পড়া শেষ। দু'জন আবার উঠে চলে যায়।

মবিনের মাঝে ঘনে হয় সে রোবটকে পড়াছে। যা বলছে লাইলী নামের ক্রপবত্তী রোবট তার মেমরি সেলে ঢুকিয়ে নিছে। পড়ানোয় রোবটের লাত কতটুকু হচ্ছে তাও ধরা যাচ্ছে না। এ ধরনের ছাত্রী পড়িয়ে আরাম নেই। তাহাড়া সারাক্ষণ তয়ে তয়ে থাকতে হয়। কোনো কারণে রোবটের মর্যাদা বা সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় সেই ভয়।

একবার একটিভ ভয়েছ পেসিভ ভয়েছ পড়ানোর সময় মবিন একটু ঝুঁকে এসেছে—চেবিলের নিচে তার পা লেগে গেল রোবটের সঙ্গে। রোবট তয়ৎকরতাবে কেপে উঠল। মুখ তুলে তাকাল মবিনের দিকে। তৌক্ষু দৃষ্টি। ঠেট কাঁপতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে এক্সনি প্রচণ্ড এক চিন্কার দেবে। মবিনের হাত—পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রোবটের মা চেবিলের নিচে কী হয়েছে বুঝতে পারলেন না। তবে মেয়ের মুখতঙ্গি দেখে কিছু আঁচ করলেন। শক্তিত গলায় বশলেন, ‘কী হয়েছে রে?’

‘লাইলী চোখ নামিয়ে বলল, ‘কিছু না।’

হঁপ ছেড়ে মবিন আবার পড়াতে শুরু করল। একবার তার ইচ্ছে করল ~~প্রক্রিয়াগতে~~ ইংরেজিতে লেখে Young lady, that was not intentional— শির্খে~~মেয়েটির~~ দিকে বাড়িয়ে দেয়। সেই সাহসও হল না। মেয়েটি যদি কী লেখা হয়েছে না পড়েই প্রেমপত্র লেখা হয়েছে মনে করে চিন্কার দিয়ে ওঠে! চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলে মবিনের জন্যে ভালো হত। ছাড়া যাচ্ছে না। দু'ঘণ্টা পরিশ্রমে সাত খনক বেতন প্রাপ্ত দু'বেলা খাওয়া তাবা যাই না।

মবিনের ধারণা ছাত্রীর রোবট তাব এবং ছাত্রীর মায়ের ব্যবরদাবি কিছুদিনের মধ্যেই কমে যাবে। যখন দু'জনই লক্ষ করবে এই মাস্টারের উদ্দেশ্য পড়ানো— চেবিলের নিচে

পা দিয়ে পা চেপে ধরা না, প্রেমপত্র লেখা না।

মবিনের ধারণা মিলছে না— দু'মাস হল সে পড়াছে, ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'মাস আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। মবিনকে পড়ানোর সময় হাত-পা খুব সাবধানে রাখতে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় সে একটা কচ্ছপ হলে মেয়েটিকে পড়ানো সহজ হত। হাত-পা খোলসের তেতর ঢুকিয়ে শুধু মাথাটা বের করে ছাত্রী পড়াত।

প্রকৃতি জীব জগতের নামান ‘ফরম’ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষের জন্যে বর্তমান ফরম বেছে নিয়েছে। মানুষের জন্যে কচ্ছপ ফরমটাও খুব খারাপ ছিল না।

মবিন তার ছাত্রীর বাসার বারান্দায় উঠে কলিংবেলে হাত ঝাঁঝল। এই আরেক বিরক্তিকর ব্যাপার। এ বাড়িতে কলিংবেল টেপার অনেকক্ষণ পর একজন বেউ এসে দরজা খোলে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় অনন্তকাল পার করে দিচ্ছে।

আজ দেরি হল না। কলিংবেল টেপামাত্র দরজা খুলে গেল। বুড়ো মাথা বের করে বলল, ‘আফা পড়ব না।’

মবিনের তুরু কুক্ষিত হল। গতকালও রোবট পড়তে আসে নি। কেন আসে নি সেই কারণও দর্শনো হয় নি। রোবটমাত্র শুধু বলেছেন— লাইলী আজ পড়বে না। তুমি রাত ন'টায় দিকে এসে খেয়ে যেও। মবিন চলে এসেছে। রাত ন'টায় তাত খাবার জন্যে যায় নি। খাওয়ার জন্যে আবার ফিরে যেতে লজ্জা লাগল। রাতে হোটেলে খেয়ে নিয়েছে। মানুষের অভ্যাস কত দ্রুত বদলায় কাল রাতে সে টের গেয়েছে। হোটেলের খাবার বলতে গেলে কিছুই খেতে পারে নি। যা খেয়েছে তাও হজম হয় নি — পেট নেমে গেছে।

বুড়ো বলল, ‘আফনেরে বলছে তাত খাইয়া যাইতে।’

‘তোমার আপা আজো পড়বে না?’

‘ঙ্গে না।’

‘পড়বে না কেন শরীর খারাপ?’

‘ঙ্গে।’

‘কী হয়েছে তার?’

‘শইল খারাপ হইছে।’

মবিন চলে আসছে। তার মন একটু খারাপ। হোটেলের তথ্যকর খাবার আজো খেতে হবে। পেট খারাপের ব্যাপারটা মনে হয় স্থায়ী হয়ে যাবে। মবিন পেট পর্যন্ত চালু এসেছে, বুড়ো ছুটে এসে বলল, ‘আমা আফনেরে ডাকে।’

রোবটের মা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন না। মবিনকে আধমন্ত্রীর মতো বারান্দায় বসে থাকতে হল। বুড়ো এসে এক সময় বলল, ‘আফনেরে ভিজুকে যাইতে বলছে।’ মবিন বুড়োর পেছনে পেছনে ঢুকল। রোবটমাত্র বললেন, ‘তুমি কলা রাতে খেতে আস নি কেন? লাইলী পড়ুক না পড়ুক তোমার দু'বেলা খাওয়ার কথা, ক্ষুমি খাবে।’

‘ওর কী হয়েছে?’

‘গায়ে গোটা গোটা উঠেছে, মনে হয় হাম।’

‘আমি কি কয়েকদিন আসা বাদ দেব?’

‘বাদ দাও। ও সুস্থ হলে আমি খবর পাঠাব।’

‘ছি আচ্ছা। আজ তাহলে যাই?’

‘এখনি যাবে কেন? ভাত খাও। ভাত খেয়ে একবারে যাও। ভাত দিতে বলেছি।’

মবিনের খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা সামনে থাকেন না। আজ রইলেন। কাছে এলেন না— দূরে বসে রইলেন। মবিনের অস্থিটি লাগছে। দীর্ঘদিন একা একা খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। মহিলাদের কেউ আশপাশে থাকলে অস্থিটি লাগে। ভদ্রমহিলা অবশ্য দূরে বসে আছেন। সেটাও অস্থিটির। মাতৃসম মহিলারা খাবার সময় এত দূরে থাকবেন কেন?

‘তোমার খাবা-শা কি বেঁচে আছেন?’

‘ছি।’

‘কোথায় থাকেন, দেশে?’

‘ছি।’

‘বাবা কিছু করেন?’

‘সুল চিচার ছিলেন। এখন প্রায়েই থাকেন। সামান্য জমিজমা আছে, না থাকার মতোই।’

‘ভাইবোন ক’জন?’

‘ভাই নেই, চার বোন।’

‘বোনদের সব বিয়ে হয়ে গেছে?’

‘দু’জনের হয়েছে।’

‘ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যে রাগ করছ না তো?’

‘ছি না।’

‘আমার কাজের ছেলেটা বলছিল তোমার ঘরে সুন্দরমতো একটা মেয়েকে দেবেছে। মেয়েটা কে?’

‘ওর নাম মিতু। ওর বড় ভাই আমার সঙ্গে পড়ুত।’

‘যে ভাই বুলের জন্যে জেল খাটছে?’

মবিন বিরক্ত হল— মহিলা সব জেনেভনেই জিজ্ঞেস করছেন মেয়েটা কে? এতসব প্রশ্নের দরকারই বা কি? সে দরিদ্র আইভেট মাস্টার। পড়াতে এসেছে, পড়িয়ে চলে যাবে। বাস।

‘ঠি মেঘে কি তোমার কাছে প্রায়ই আসে?’

‘ছি।’

‘মেয়েটা কী করে?’

‘সিনেমায় ছোটখাটো ঘোল করে।’

‘এতেই ওদের সৎসার চলে?’

‘চলে আর কোথায়? কোনোমতে জীবন ধারণ করা।’

‘তিনজনের সৎসার, বাড়ি ভাড়া, বোনের সুলের খরচ সব মেঘের সামান্য রোজগারে চলে?’

‘চালাতে হয়।’

‘আমি মেয়েটার নামে অনেক আজ্ঞেবাজে কথা শুনি। দামি দামি গাড়ি নাকি মাঝেমধ্যে নামিয়ে দিয়ে যায়।’

মরিনের খাওয়া হয়ে গেছে। সে হাত ধোয়ার জন্যে উঠল। ভদ্রমহিলা নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। উপদেশ দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ‘এ জাতীয় মেয়েদের সাথে সম্পর্ক না রাখাই ভালো।’

মরিন কঠিন কিছু কথা বলতে গিয়েও বলল না। কী হবে কঠিন কথা বলে?

‘আমি তাহলে যাই?’

‘বোস। আরেকটু বোস। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।’

মরিন বিস্তৃত হল। তার সঙ্গে এই মহিলার কী জরুরি কথা থাকতে পারে? টেবিলের নিচে একবার তাঁর রোবটকন্যার পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে গিয়েছিল— এই ঘবরটা কি মেয়ে তার মা’কে জানিয়েছে?

‘এই ঘরে না, পাশের ঘরে আস। এই ঘরে লাইলীর বাবার কাছে বাইরের লোকজন আসে।’

মরিন পাশের ঘরে গেল। এটা মনে হচ্ছে গেষ্টরম। সুন্দর করে সাজানো। আলনা খালি দেখে মনে হয় কেউ থাকে না। ‘বোস, তুমি চেয়ারটায় বোস।’ মরিন অস্পষ্টির সঙ্গে বসল। ভদ্রমহিলা দরজা ভিজিয়ে দিয়ে মরিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলার শব্দ নিচু করে বললেন, ‘কাজের ছেলেটা যে দুপুরে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে যায়— লাইলী কি ঐ ছেলের হাতে তোমাকে কোনো চিঠি পাঠিয়েছে?’

মরিন হতঙ্গ হয়ে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা বিষণ্ণ গলায় বললেন, ‘সত্ত্বি কথা বল। আমি খুব অশান্তিতে আছি।’

‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও শুধু শুধু আমাকে চিঠি লিখবে কেন?’

‘ক্ষুণ্ণ না।’

‘আচ্ছা তুমি যাও।’

‘সমস্যাটা কী হয়েছে আপনি কি বলবেন?’

‘না, সমস্যা কিছু না।’

‘আমার কারণে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে আমাকে বলে দিন।’

‘বললাম তো কোনো সমস্যা হয় নি।’

‘আপনার যদি মনে হয় লাইলীকে পড়াতে না এলে তালেন যাব— তাহলে আমি কাল থেকে আসব না।’

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললেন, ‘আচ্ছা তাহলে তুমি বরং এস না।’

‘ক্ষুণ্ণ আচ্ছা।’

‘আমি শনেছি তুমি চাকরি খুঁজছ, পাছ না। আমি লাইলীর বাবাকে বলে দেব যদি কিছু করতে পারে। ওর তো অনেক জানাশোনা।’

‘তার কোনো দরকার নেই। আমি তাহলে যাই?’

‘দাঢ়াও একটু, তোমার বেতনটা দিয়ে দিই।’

মবিন বেতনের অপেক্ষায় বসে রইল। মাস এখনো শেষ হয় নি। দীর্ঘদিন বাকি। মবিনকে তিনি খামে করে পুরো সাত শ টাকা দিয়ে গেলেন। যবিনের এত খারাপ লাগছে বলার নয়। তার ইচ্ছা করছে টাকাটা রেখে চলে আসতে। সেটা বড় ধরনের অভদ্রতা হয়। সেই অভদ্রতা করার অধিকার তার নেই। তারচেয়ে বড় কথা— সাত শ টাকা তুচ্ছ করার মতো মনের জ্ঞানও তার নাই। সাত শ টাকা অনেক টাকা।

সম্মাবলো এখন আর তার কিছু করার নেই। একটা টিউশ্যানি ছেড়ে দিয়ে এইটা নিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে একুল ওকুল দু'কুলই গেছে।

চিঠির ব্যাপারটাও বেশ রহস্যময়। এই মেয়ে তাকে চিঠি লিখবে এ জাতীয় উদ্ভৃত চিঙ্গা তন্মহিলা কেন করছেন? এতটা সন্দেহ বাতিকঞ্চ হলে চলবে কীভাবে?

যবিনের নিজের কুঠুরিতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে সেখানে গিয়ে? শীতলপাটির বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে? বালিশের নিচে রাখা মা'র চিঠিটা দিতীয়বার পড়বে?

বাবা মবিন,

আমার দোয়া নিও। দীর্ঘদিন তোমার পজাদি পাইতেছি না। তোমার বাবার চোখের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে। ডাঙ্গার দেখাইয়াছি। তাহার অভিযন্ত অতি সত্ত্বর চাকা নিয়া চিকিত্সা না করাইলে চক্ষু নষ্ট হইবে। এখন তোমার বিবেচনা।

তুমি সৎসনের হাল অবস্থা জান। জানিবার পরও তোমার কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাতে আমি এবং তোমার বাবা দু'জনই মর্মাহত। গত মাসে মাত্র পাঁচ শ টাকা পাঠাইয়াছি। অর্থ তুমি জান জোছনার সন্তান হইবে। সে এই কারণে বাবা-মা'র কাছে আসিয়াছে। আমি কোন মুখে জামাইয়ের নিকট হাত পাতিয়া আমার মেয়ের সন্তান প্রসবের বরচ নেই?

তোমার কারণে জামাইয়ের কাছে মাথা হেঁট হইয়াছে। যাহা হউক শুনিয়া খুশি হইবে জোছনার পুত্র সন্তান হইয়াছে। জামাই অত্যন্ত খুশি হইয়াছে। নাতির মুখ দেখিয়া আমি কিছু দিতে পারি নাই। এই লঙ্ঘা ঝাখিবার আমার জায়গা নাই। তুমি অতি অবশ্যই একটি সোনার চেইন খরিদ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।

আঞ্চাহপাকের দুরবারে স্বৰ্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি। দোয়াগো—

তোমার মা।

মবিন রাত আটটা গর্জন বাস্তায় বাস্তায় হাঁটল। তাবপর বন্ধু হল মিতুদের বাড়ির দিকে।

তার মন বেশিরকম খারাপ হয়েছে। মিতুকে না দেখলে মন তালো হবে না।

মিতু বাসায় ছিল না।

বুমুর হাসিমুখে বলল, ‘আপা রাতে ফিরবে না। আপার সঙ্গে দেখা করতে হলে সাবাবাত থাকতে হবে। আপা তোর আটটার দিকে চলে আসবে। ভালোই হয়েছে, আসুন

আমরা সারারাত গুরু করে কাটিয়ে দিই। আপনার কি শয়ীর টোলির খারাপ করেছে মিবিন
তাই? কী অঙ্গুত দেখাচ্ছে!'

'চা খাওয়াতে পারবে?'

'অবশ্যই পারব। চিনি এবং চ' পাতা ছাড়া চা বানাতে হবে। দু'টাই নাই।'

'তুমি পানি গরম করতে দাও, আমি নিয়ে আসছি।'

'আপনি কি জানেন মিবিন তাই দু'দিন আগে যে রাতদুপুরে আপমার খৌজে
গিয়েছিলাম?'

'জানি না তো।'

'তা জানবেন কেন? আপনি কি আমাদের খৌজ নেন? খৌজ নেন না। আমরাই যখন
তখন আপনার কাছে ছুটে যাই। মা'র শয়ীর হঠাতে খুব খারাপ করেছিল। তখন আপনাকে
আনতে গিয়েছিলাম।'

'কী হয়েছিল?'

'সে এক লম্বা গুরু, আপনার শুনতে অনেক সময় লাগবে। চা পাতা আর চিনি নিয়ে
আসুন, তারপর আপনাকে বলব। আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে মিবিন তাই?'

'না।'

'খুব ভালো হয়েছে, রাতে আমার সঙ্গে থাবেন। আমি আপনাকে বান্ধা করে খাওয়াব।
যবে অবশ্য রান্নারও কিছু নেই। আপনাকে ডিমও কিনে আনতে হবে।'

'আর কিছু লাগবে?'

'না আর কিছু পাগবে না। আপনি কিছু বেশি দেরি করতে পারবেন না— যাবেন আর
আসবেন।'

'আচ্ছা।'

'চুন রাস্তা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই। আপনাকে একটা গোপন ঘবর বলি মিবিন
তাই। কাউকে কিন্তু বলবেন না। আপা যদি জানে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ঘবরটা কী?'

'গতকাল থেকে আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা হচ্ছে। আমি পরীক্ষা দিল্লি না। পরীক্ষা দিয়ে
তো গোল্ডাই খাব। কী দরকার সেখে গোল্ডা খাবার?'

বুমুর খিলখিল করে হাসছে। বুমুরের হাসিও মিতুর মতো। হাসলে ঝন্ধাল ঝন্ধ হয়।
মিবিনের হাসি শুনতে তাঁরো শাগচ্ছে।



জয়দেবপুর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে মোবারক সাহেবের একটা কুঁড়েঘর আছে। শোকে
বাসাবাড়ি তৈরি করে; তিনি কুঁড়েঘর বানিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই কুঁড়েঘর। তিনি একব
জমি নিয়ে ছোট মাটির ঘর। খড়ের ছান।

আধুনিক কুঁড়েঘরের এক ফ্যাশন ইন্দোনীশ চালু হয়েছে। মাটির দেয়াল, খড়ের ছানের
তেজের থাকে কার্পেট। এবার বৃক্ষার বিজ্ঞিন করে চলে। বাধকম হয় মার্বেল পাথরের।
কুঁড়েঘর নিয়ে এক ধরনের রসিকতা।

মোবারক সাহেব তা করেন নি। তার ঘরে বড় একটা চৌকি পাতা। চৌকির উপর
হেগলার পাটি— মাথার নিচে দেশার জন্যে শক্ত বাণিশ। এ বাণিতে কোনো টেলিফোন
নেই। তিনি ইলেক্ট্রিসিটি আন্তে না। সন্ধ্যার রিহারিশে ঝুলে

দৰ্শনীয় ক্ষেত্রে বাগানও কোথা হয় নি। ফেলার ময় পাহাড়ড়া বা ছল এখনো ভাই
আছে। তিনি শুধু তাঁর জমিটা কঢ়িক্রটের পিলার এবং শক্ত কাটাতারের বেড়া দিয়ে আলাদা
করেছেন। বাড়ির গেটে পাহাড়াদার আছে।

বছরে দুঁ একবার শুধু রাত কাটাতে আসেন। রাত ন'টা-দশটার দিকে এসে
তোরবেলা চলে যান। একাই আসেন। পাহাড়াদার দু'জন গেটে তালা দিয়ে চলে যায়।

আজ একা আসেন নি। মিভুকে সঙ্গে এনেছেন। পাঞ্জেরো জিপ তাদের নামিয়ে চলে
গেছে। মোবারক সাহেবের গেটের দারোয়ান দু'জনকেও চলে যেতে বলেছেন। তারা
এখনো যায় নি। মোবারক সাহেবের মালপত্র ঘরে চুকিয়ে গেটে তালা দিয়ে তারা যাবে।
রাতটা ধাকবে জয়দেবপুরে। তোরবেলা এসে গেটের তালা খুলবে।

মিভু হকচিক্রিয়ে গেছে। তার চারদিকে ঘোর অঙ্কুর। জোনাকি পোকা খুলছে-নিভছে।
আলো কলতে জোনাকি পোকার আলো।

মোবারক সাহেব হালকা পলায় কলানে, ‘তয় লাগছে?’

মিভু বলল, ‘না। তয় লাগার কিছু আছে কি?’

‘সাগ আছে। বর্বাকাল তো— খুব সাপের উপর্যুক্ত।’

মোবারক সাহেবের হাতে ছোট একটা পেনসিল ছেঁট। টেক ছোট হলেও আলো তীব্র।
তিনি আলো ফেলেন। বোগবাড়ের তেজ দিয়ে গুরুত্ব। জায়গায় জায়গায় পানি জমে
আছে। সেখানে ইট বিছানো। মোবারক সাহেব টেক নিভিয়ে ফেলেন— ঘন অঙ্কুরে
চারদিক ছেকে গেল।

দারোয়ান দু'জন ভিন্নসম্পত্তি রেখে চলে এসেছে। কুঁড়েরে আলো ছেলে এসেছে।
জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলোর বেশ দেখা যাচ্ছে।

মোবারক সাহেব টুট্টা মিঠু দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘তুমি চলে যাও। আমি
ওদের বিদেয় করে আসছি।’ মোবারক সাহেব তেবেছিলেন মিঠু বলবে— আমার একা
যেতে ভয় লাগছে। আমি অপেক্ষা করি। দু'জন একসঙ্গে যাব। মিঠু তেমন কিছুই বলল
না। টুর্চ হাতে এগিয়ে গেল।

তিনি দারোয়ানদের বিদেয় করলেন। শেষে জালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে মিয়ে
নিলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সিগারেট আছে কিনা। সিগারেট আছে। কয়েকদিন
হল সিগারেট বেশি খাওয়া হচ্ছে। তিনি একটা সিগারেট ধোলেন। আকাশ মেঝে বলে
তারার আলো নেই। চাদ উঠবে রাত তিনটার দিকে। কাজেই রাত তিনটা পর্যন্ত এমন হল
অন্ধকার থাকবে। বিষি পোকা ডাকছে না। এই অঞ্চলের বিষি পোকার ডাক বিদ্যুত।
এরা ডাকা বন্ধ করেছে এর অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হবে। বৃষ্টি শুরুর আগে
আগে বিষি পোকা ডাক বন্ধ করে দেয়। জোনাকি পোকারাও তাদের আলো নিয়ে
ফেলে। জোনাকি পোকারা অবশ্য তাদের আলো এখনো নিভায় নি। কাজেই বৃষ্টি শুরু
হতে একটু দেরি আছে। এইসব তথ্য তিনি তার কুঁড়েরে রাখি যাপন করে শিখেছেন।

তাঁর শেখার ক্ষমতা ভালো। তিনি দ্রুত শিখতে পারেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিও
ভালো। লেখালেখির ক্ষমতা থাকলে তিনি ভালো লেখক হতে পারতেন।

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তবু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েটি ঘরের তেতর কী
করছে কে জানে। তার কি উচিত না উবিলু হয়ে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ানো? মেয়েটি
তাঁকে পছন্দ করছে না। কিন্তু একদিন করবে। অবশ্যই করবে। মেয়েটির শরীর তিনি
কিনে নিয়েছেন। আজ্ঞা শরীরেই বাস করে। একদিন সেই আজ্ঞা ও তিনি কিনতে পারবেন।
বেঁচে থাকার জন্যে একটি শুল্ক ও সুন্দর আজ্ঞার তাঁর খুব প্রয়োজন।

তিনি আকাশের দিকে তাকালেন— তারা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নামবে। আজ রাতে
কোনো এক সময় ঘনবর্ষণ হবে। ঠিক কখন হবে তা বলা যাচ্ছে না। মানুষকে সেই
ক্ষমতা দেয়া হয় নি। সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে মানুষের চেয়ে অনেক নিষ্পত্তিশৈলীর
পদ্ধতিকিংবা কৌট্টিগতদ্বারা। গাছদের কি দেয়া হয়েছে? অবশ্যই দেয়া হয়েছে। তাঁর ধারণা,
প্রতিটি গাছ জানে কখন বৃষ্টি হবে। তাঁর এই বাগানবাড়ির প্রতিটি গাছ অপেক্ষা করছে...।

সরসর শব্দ করে তাঁর ডান দিকের ঝোপে কী যেন চলে গেল। সাপ হতে পারে।
বৃষ্টির আগে আগে তারা জায়গা বদল করে নিচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে ধখন সাপের শুরু ভর্তি
হয়ে যায় তখন তারা কী করে? তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির পানিতে ডুবে বসে থাকেন।

মোবারক সাহেব ঘরের দিকে এগোলেন। টর্চলাইটটা হাতে থাকলে হত্তি। অন্ধকারে
কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলছেন কে জানে। এক জায়গায় পাতার জমে ছিল। তিনি
পানিতে পা ফেলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে ফেললেন।

কুঁড়েরের বারান্দায় বড় বালতি ভর্তি পানি। পানির উপর মগ ভাসছে। একপাশে
সাবানদানিতে সাবান। তিনি উঠানে উঠে সহজ স্বরে জাকেলেন, ‘মিঠু হারিকেল নিয়ে এস
তো।’

মিঠু হারিকেল হাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

‘মগে করে আমার পায়ে পানি চাল। কাদায় পা দিয়ে ফেলেছি।’

মিতু পানি ঢালছে। মোবারক সাহেব বললেন, ‘আমার বাগানবাড়ি পছন্দ হয়েছে’
‘হয়েছে।’

‘মনে হচ্ছে না জায়গাটা পৃথিবীর বাইরে?’

মিতু জবাব দিল না। মোবারক সাহেব বললেন, ‘আমার মাঝে মাঝে একা থাকতে
ইচ্ছা করে, তখন এখানে আসি।’

‘আজ তো একা আসেন নি।’

‘না, আজ অবশ্যি একা আসি নি। এখানে একা রাত্রি যাপন করতে কেমন লাগে তা
আমি জানি। দু’জনে কেমন লাগে তা জানি না। এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি।
দু’জনে মিলে অঙ্ককার দেখব, ইন্টারেক্টিং সব গুরু করব। আমি অসংখ্য অনুভূত গুরু জানি।
সবচে বেশি জানি ভূতের গুরু। ভূতের গুরু তোমার কেমন লাগে?’

‘ভালো লাগে।’

মোবারক সাহেবের হাত-মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। তিনি কিছু বলার আগেই
মিতু ঘরের তেতর চলে গেল। তোয়ালে এনে হাতে দিল। তিনি তোয়ালে দিয়ে হাত-পা
মুছলেন।

‘বারান্দায় কিছুক্ষণ বসা যাক কী বল মিতু।’

‘আপনি যা বলবেন তাই হবে। কোথায় বসব? চেয়ার তো নেই।’

‘ঘরের তেতর মাদুর আছে। তুমি খুঁজে পাবে না, আমি নিয়ে আসছি।’

মোবারক সাহেব নিজেই মাদুর এনে বিছিয়ে দিলেন! শান্ত ঘরে বললেন, ‘পুরোপুরি
অঙ্ককার হলে ভালো লাগত। কিন্তু আগো কিছু রাখতেই হবে— নয়তো সাপ উঠে
আসবে। একবার কী হয়েছে শোন— একা একা বারান্দায় বসে আছি। চারদিক অঙ্ককার,
ঘরের বাতিও নেড়ানো। পা মেঝে বসে অঙ্ককার দেখছি। হঠাৎ তারি কী যেন পায়ের
উপর উঠে গেল। পায়ে যে সাপ উঠে গেছে সেটা বুঝতে বুঝতে সাপ নেমে গেল। কয়েক
সেকেন্ডের ব্যাপার, কিন্তু মনে হয় অনন্তকাল। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

মিতু বসল; মোবারক সাহেব বললেন, ‘অরাম করে বোস।’

‘আমি অরাম করেই বসেছি।’

‘তুমি গান জান?’

‘কিন্তু না।’

‘ভালো চিচার রেখে গান শেখার ব্যবস্থা করে দেব। তোমার গনা ভালো। গান
ভালোই গাইবে। তাছাড়া নাচ-গান এইসব ভালোমতো জানা তোমার নিজের শর্থেই
দরকার। ছবির জগতের এধান নায়িকা নাচ-গান না জানলে চলে? আরু হে একটা ছবি
বানাছি সেটা কি তুমি জান?’

‘কিন্তু শনেছি।’

‘সেই ছবির তুমই প্রধান নায়িকা এটা শনেছ?’

‘আঁচ করতে পারছি।’

‘তোমার ভালো লাগছে না?’

চারদিকের বিপুল গাঢ় অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে মিতু বলল, ‘ভালো লাগছে। খুব
ভালো লাগছে।’



প্রায় এক ষণ্টির মতো হল মবিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে। চিঠি যখন পড়েছে তখন ঘরে দিনের আলো ছিল। এখন অঙ্ককার। মবিন আলো জ্বালে নি। অঙ্ককার ঘরেই বসে আছে। তার চারদিকে পিনপিন করছে মশা। মশা তাড়াবার স্বাভাবিক ইচ্ছাও হচ্ছে না।

অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সিলেটের চা বাগানের এক ব্রিটিশ মালিক খোদ ইংল্যান্ড থেকে জানাচ্ছেন— তাকে সাক্ষা টি গার্ডেনের ম্যানেজারের নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। এক বছরের ট্রেনিং পরিয়ডের পর চাকরি স্থায়ী হবে। ট্রেনিং পর্ব দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম চার মাস ট্রেনিং হবে স্কীলিংকার 'ইয়ালো রিং টি গার্ডেনে'। পরের আট মাস ইংল্যান্ডে।

ট্রেনিং পরিয়ডের ভাতো উল্লেখ করা আছে। অঙ্কটা বিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। পোশাক পরিছেন এবং প্যাসেজ মানির জন্যে চেস ম্যানহাটন ব্যাথকের ইস্যু করা একটি ব্যাংক স্লাফট চিঠির সঙ্গে আছে। পাউত স্টারলিঙ্গে যে অঙ্ক সেখানে বসানো তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

চা বাগানের চাকরির চেষ্টা সে করেছিল। ইন্টারভু দিতে চিটাগাং পর্যন্ত গিয়েছিল। যাওয়া-আসার ভাড়া মিতু দিয়েছিল। সেই চাকরি ছোট একটা চাকরি। অন্য চা বাগান। এই যোগাযোগ কী করে হল মবিন বুঝতে পারছে না। ইন্টারভু বোর্ডের কেউ কি তার জন্যে সুপারিশ করেছেন? রহস্যটা কি?

মবিনের ইতর্থ ভাব বিছুতেই কাটছে না। চেস ম্যানহাটন ব্যাথকের স্লাফটটা সঙ্গে না থাকলে তা বত কেউ রসিকতা করছে। মানুষ নির্মম রসিকতা মাঝেমাঝে করে।

এখন সে কী করবে? আনন্দ প্রকাশের জন্যে কিছু একটা কর্মসূচিত। কাকে খবরটা প্রথম দেয়া যায়? মিতুকে তো বটেই। যদিও তার ইচ্ছা হচ্ছে একটা মাইক ভাড়া করে গাঞ্জীপুর শহরে রিকশায় ঘুরে ঘুরে খবরটা বলে বেড়ায়।

এ রকম একটা খবর মিতুকে খালি হাতে জ্বরান্বন্ধে যাবে না। এক লাখ গোলাপ কিনতে পারলে এক লাখ গোলাপ নিয়ে মিতুর কাছে যাওয়া যেত। কত দাম এক লাখ গোলাপের?

মিতু খবরটা শুনে কী করবে? কী করবে মিবিন আন্দাজ করতে পারে। চট করে উঠে দাঢ়াবে, তারপর ছুটে সামনে থেকে চলে যাবে। কাঁদার জন্যে যাবে। মিতু তার সামনে কাঁদতে পারে না। অনেকক্ষণ পর সে ফিরে আসবে। খুব স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারবে না। মিতুর ধারণা অভিন্নেরী হিসেবে সে খুব বড়। আসলে বড় না। আসলে সে কঁচা অভিন্নেরী। আবেগ লুকাতে পারে না।

না মিতুকে খবরটা এভাবে দেয়া যাবে না। মজ্জা করে দিতে হবে। মুখ শুকনো করে তার কাছে যেতে হবে। বেশ রাত করে। মিতু উঠিয়ে হয়ে বলবে, কী ব্যাপার এত রাতে? তখন সে বলবে, ঘরে কোনো খাবার আছে মিতু? সারাদিন খাই নি। হাত একেবারে খালি। সজ্জায় আসতেও পারছিলাম না। এটা শুনে মিতুর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পানি এসে যাবে এবং সে দৌড়ে সামনে থেকে চলে যাবে। আধঘণ্টা পর এসে বলবে, এস যেতে এস। এমনভাবে বলবে যেন কিছুই হয় নি।

মা'কে একটা চিঠি লিখতে হবে। আজ রাতেই চিঠি লিখতে হবে।

মা,

আমার সালাম নিও।

তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান আমেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরি হল। জোছনার ছেলে হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়েছি। ওকে আমার অভিনন্দন দিও। বাবার চোখের খবর শুনে উঠিয়ে বোধ করছি। আমার উচিত নিজে শিয়ে বাবাকে নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চা বাগানের ম্যানেজারের একটা চাকরি পেয়েছি। প্রাথমিক ট্রেনিংতে আমাকে শুলিংকা এবং পরে ইঞ্জ্যাভে যেতে হবে। তিসা এবং অন্যান্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে। যাই হোক, আমি টাকা পাঠাচ্ছি। তৃষ্ণি বাবাকে নিয়ে চলে এস। আমি এখানে তালো একটা হোটেল ব্যবস্থা করে রাখব। তোমরা তাকায় আসার পর বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটছুটির কাজগুলো মিতু করবে। মিতু হচ্ছে রফিকের বোন। ঐ যে একবার রফিককে নিয়ে এসেছিলাম। বাঁশি বাজিয়ে যে সবাইকে হতভন্দ করে দিয়েছিল।

মিতু খুবই চালাকচুর যেয়ে। সে তোমাদের কোনো অসুবিধাই হতে দেবে না। আমি যখন দেশের বাইরে থাকব তখনো সে-ই তোমাদের দেখাশোনা এবং খোঁজখবর করবে।

তোমরা কবে নাগাদ আসবে আমাকে টেলিফোন করে জানিও। তালো  জোছনার ছেলের জন্যে সোনার চেইন, জোছনার জন্যে তালো একটা শাড়ি কেম্বেজ জন্যে আলাদা করে টাকা পাঠালাম। তোমরা তালো থেক। বাবাকে আমার সালাম দিও...

‘ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন?’

মিবিন দাক্ষণ্য চমকে উঠল। মিতু দাঁড়িয়ে আছে সুবজার কাছে। মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। মিবিন উঠল। বাতি জ্বালাল। অন্তুত গলায় বগল, ‘ভেতরে এস মিতু।’

মিতু ঘরে চুকতে চুকতে বলল, ‘অন্ধকারে মৃত্তির মতো বসে কী করছিলে?’

‘চিঠি লিখছিলাম?’

‘চিঠি লিখছিলে মানে?’

‘মনে মনে লিখছিলাম। মনে মনে চিঠি লিখতে কাগজ, কলম, আলো কিছুই লাগে না। মনে মনে লেখা চিঠিতে কোনো বানান ভুলও হয় না।’

‘কী হয়েছে তোমার বল তো?’

‘অদ্ভুত একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা রেজিস্ট্রি ডাকে ইংল্যান্ড থেকে এসেছে।’

‘বারাপ কিছু?’

‘ভয়ংকর থারাপ। নাও পড়।’

মিতু চিঠি পড়ছে। মবিন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিতুর দিকে। সে যা ভেবেছে তাই। মিতুর চোখে পানি এসে গেছে। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, ‘দশ হাজার পাউন্ড স্টারলিং মানে কত টাকা?’

‘ষাট দিয়ে শুণ দাও। শুণ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।’

‘তোমর হাতে তো একদম সময় নেই।’

মবিন উদ্ধিষ্ঠ গলায় বলল, ‘ছেটাছুটি করতে করতে জান বের হয়ে যাবে। শোন তোমাকে আগেভাগে বলে রাখছি, যাবতীয় ছেটাছুটিতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। সিনেমা চিনেমা বাদ দাও। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আর কষ্ট করতে হবে না।’

‘আর কষ্ট করতে হবে না?’

‘অবশ্যই না। আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমার যাবতীয় কষ্টের অবসান হল, বুমূরকে নিয়ে বা তোমার মা’কে নিয়েও তোমার চিন্তা করতে হবে না।’

‘সব চিন্তা তোমার?’

‘অবশ্যই। বিশ্বের ব্যাপারটা এক সঙ্গাহের মধ্যে সেরে ফেলব। বাবা চোখ দেখানোর জন্যে ঢাকা আসবেন, যাও আসবেন। বুমূর আছে, তোমার মা আছেন— আমরা আমরাই, বাইরের কাউকে বলার কোনো দ্রব্য নেই। বাইরের কেউ তো নেইও। তুমি যদি তোমার ফিল্ম লাইনের কাউকে বলতে চাও বলবে।’

‘টেপীকে বলব?’

মিতু এমনভাবে থেশন্ট করল যে মবিন চমকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। মিতু হাসল। সহজভাবেই হাসল। সেই হাসিতেও কিছু একটা ছিল। মবিন চোখ ফেরাতে পেরিল না। মিতু বলল, ‘তোমার জন্যে সিগারেট এনেছি। নাও।’

মবিন হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে নিতে অস্পষ্ট গলায় বলল, তিতু তুমি হঠাত করে টেপীর কথা তুললে কেন?’

মিতু শান্ত হয়ে বলল, ‘তোমার এত বুদ্ধি। তারপরেও একটা সাধারণ ব্যাপার ধরতে তোমার এত সময় লাগল কেন?’

মবিন সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে। তার চোখ-মুখ ঝ্যাকাসে। মিতু বলল, ‘আমার ধারণা টেপীকে তুমি অনেক আগেই ধরেছ। তারপরেও না ধরার ভান করে গোছ। নিজের সঙ্গে ভান। নিজেকে অতারণ। তাই না?’

মবিন কিছু বলগ না।

মিতু বলল, ‘এখন বল। আমার দিকে তাকিয়ে বল, এখন কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে?’

‘পারব।’

‘সত্যি পারবে?’

‘অবশ্যই পারব।’

মিতু ছোট নিশাস ফেলে বলল, ‘আমারও মনে হয় তুমি পারবে। কিন্তু বিয়েটা ভালো হবে না। যতবারই আমাকে জড়িয়ে ধরবে ততবারই মনে হবে— আরো অনেকে এই ভঙ্গিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরবে। মনে পড়বে না?’

‘না।’

‘ছেলেমানুষের মতো কথা বলবে না তো মবিন ভাই। তুমি ছেলেমানুষ না। তুমি এখন চোখ-কান বদ্ধ করে আমাকে বিয়ে করবে। তার পেছনে ভালবাসা অবশ্যই আছে। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। আমি তোমার দুশ্সময়ে তোমাকে নানাভাবে সাহায্য করবে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ। ঠিক কিনা বল?’

মবিন চুপ করে রইল। তার হাতের সিগারেট নিতে গেল। মিতু হালকা গলায় বলল, ‘দুঃজনের জীবন নষ্ট করে তো লাত নেই। একজনেরটাই নষ্ট হোক। একজন ঢিকে থাক; তুমি খুব ভালো দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি সুবে আছ, অনন্তে আছ এই দৃশ্য দূর থেকে দেখলেও আমার ভালো লাগবে। একদিন হয়তো তোমার চা বাগানে বেড়াতে যাব। তোমার বাধলোতে বসে তোমার সঙ্গে এককাপ চা খাব। তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ছবি তুলব। সেই আনন্দও কম কি?’

মিতুর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে বলল, ‘মবিন ভাই তোমার কাছে কুমাল আছে; দাও কুমাল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দাও। আমি এখন চলে যাব।’

মবিন সিড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। হালকা পায়ে নেমে যাচ্ছে মিতু। সে মাথার উপর শাড়ির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাকে কেমন কট বটে লাগছে। চারদিকের বিপুল অঙ্ককারে মিশে যাবার জন্যে নেমে যাচ্ছে অপূর্ব একটি মেঘে। তাকে কি এইভাবে নেমে যেতে দেয়া উচিত?

মবিন কঠিন গলায় ডাকল, ‘মিতু দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ তুমি? উঠে এস। উঠে এস বলবাম।’

মবিন এখন পর্যন্ত কোনোদিন মিতুর হাত ধরে নি। তার খুব লজ্জা লাগে। এই প্রথম লজ্জা শেঙ্গে সে মিতুর হাত ধরল। আহ কী কোমল সেই হাত!